যুগে যুগে

– শাব্বীর আহমদ

শাটী থেকে *শাড়ি* শব্দের উৎপত্তি। শাটী সংস্কৃত শব্দ। শাড়ি সর্বস্তরের বাঙালি রমণীর পোশাক। ঘরে– বাইরে, আচার–অনুষ্ঠানে, উৎসব–পার্বণে, শোকে–দুঃখে বাঙালি রমণীদের শাড়িই প্রিয় পোশাক। শাড়ি মেয়েদের পরিধেয় ছিল চোদ্দ শতকেও। তার প্রমাণ আমরা পাই কল্পকাহিনী, গল্প গাথায়, কবিতা ও গীতি কবিতায়। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে বস্ত্রটি যে শাড়ি ছিল তেমন কথা মহাভারতে পরিষ্কার লেখা নেই। তবুও অনুমানে কষ্ট হয় না যে, দ্রুপদ দুহিতার এই বস্ত্র খণ্ডটি শাড়িই ছিল। বস্ত্র মানে পরিধেয় বসন অর্থাৎ শাড়ি *হরণ* শব্দটি দীর্ঘ বস্ত্র খণ্ড প্রতীয়মান হয়। দ্রৌপদীর সেই বস্ত্র খণ্ডটিও দীর্ঘ ছিল। পুরো হরণের বর্ণনায় তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই উপমহাদেশের বাইরে শাড়ি প্রধানভাবে আছে শ্রীলংকা ও নেপালে। ইরান, মালয়শিয়া ও মায়ানমার–এ শাড়ির প্রচলন রয়েছে। বলা যায়, শাড়ি একমাত্র বাঙালি রমণীর পরিধেয় বসন নয়। তবে প্রতিনিধিত্ব করছে কেবল বাঙালি রমণীকুল। ভৌগলিক বিচারে বলা যায়, শাড়ি চলাফেরার জন্য এ দেশে অনুকূল। রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীতে শাড়ির সুবিধা হচ্ছে সারা শরীর ঢাকা যায় এক সঙ্গে। গরমে যেমন ঢিলা করে পরা যায় তেমনি শীতের আচ্ছাদনে উষ্ণতা নেয়া যায়। শাড়ি অভাবী মানুষের কাছে সহজলভ্য হতে পেরেছে। একটি সুতির মোটা শাড়ি হলে আর কিছু না হলেও চলে। দুই প্যাচ দিয়ে পরে আব্রু রক্ষা অনেক সহজ।

সন্তান পালনেও শাড়ির সুবিধা বহুমাত্রিক। লম্বা আচলে সন্তানের পরিচর্যা ও উষ্ণতা দেয়া সহজ। সেকালে, গৃহকর্ত্রীর চাবি ছিল তার মূলধন ব্যবহারিক ও ভাবগত অর্থে। চাবি ছিল তার আচলের সঙ্গী। চাবি আচলের মাথায় বেধে রাখা হতো বলে তা পিঠে আচলের অবস্থান অনড় রাখতে সাহায্য করতো। এই আচলের কোণায় টাকা পয়সা রাখা হতো। খরচের সুবিধার জন্য দিনের খরচের টাকা বেধে রাখা হতো গিন্নির আচলেই। মায়ের আচলের সেই প্রান্ত ভাগ ছিল দস্যি ছেলের লক্ষ্যস্থান। কারণ রাশভারী পিতার সঙ্গে তার দূরত্ব তো যোজন–যোজন।

শাড়ির উৎপত্তি, বিবর্তন, বর্ণাঢ্য বিকাশ ও বর্ণালী প্রকাশ সবই এ দেশের আলো–হাওয়াতে। আজকে যে শাড়ির রূপ, পরার কায়দা তা আদিকালে ছিল না, পালটেছে যুগে যুগে।

কালিদাসের *শুকুন্তলার শাড়ি* আর বিদ্যাসুন্দরের *বিদ্যার শাড়ি* এক নয়। রবীন্দ্রনাথের লাবণ্যের শাড়ি আর বিভূতিভুষণের সর্বজয়ার শাড়ি এক নয়। এক নয় নজিবর রহমানের আনোয়ারা–র শাড়ি আর শরৎচন্দ্রের মেজদিদির শাড়ি। এ ভিন্নতা শুধু শাড়ির বাঙময় বৈচিত্রে নয়, পরার ধরনেও। শাড়ি আকড়ে ধরে কোমর, কোমর জড়িয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে ওঠে উপরে, লতিয়ে থাকে বুকে কণ্ঠ বেষ্টন করে, কাধ ছুয়ে ছড়িয়ে পড়ে পিঠে।

একালের প্রিয় কুচি পদ্ধতির শাড়ি পরা প্রথম চালু করে অবাঙালিরা। প্রথম দিকে কুচি ছিল সামনের দিকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো। পরে ধরন হয় একের পর এক ভাজ করে সুবিন্যস্ত আকারে। সাহস করে বাঙালি সমাজে যারা পরেছেন তাদেরকে মেমসাহেব, কৃশ্চিয়ান, ব্রাহ্মণ, হিন্দুস্তানি বলে কটাক্ষ

শুনতে হয়েছে। কুচি পদ্ধতিকে আজকের রূপে প্রথম চালু করেন জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারের মেয়েরা। এক প্যাচের প্রথা আজো বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। খাটি বাঙালির অনুভূতির সঙ্গে এক প্যাচের পরা শাড়ির কোথায় যেন গভীর একত্মতা রয়েছে। তাই উদ্বেলিত মুহূর্তে, মনের মাধুরী মিশিয়ে এক প্যাচ দিয়ে শাড়ি পরেন বাঙালি রমণীকুল। এক প্যাচ এই ধরন বিশেষ স্থান দখল করে আছে আবহমান গ্রাম বাংলার পল্লিবালাদের কাছে।

সীতাদেবী যে সুন্দর শাড়িটি পরতেন তার নাম *অমুকা*। রাধা যখন কৃষ্ণাভিসারে যান তখন পরেছিলেন রূপালী জরি কাজের মেঘবরণ শাড়ি। প্রথম মা হলে পরিবার বা প্রিয়জন উপহার দেন তার নাম *অধ্যয়া*। স্বামী তীর্থধর্ম সেরে বিদেশ থেকে ফিরলে তার সম্মানে যে উৎসব হতো তাতে স্ত্রী *বীরাঞ্জলি* নামের এক বিশেষ ধরনের শাড়ি পরতেন। নববধূর শাড়ির রঙ লাল। লাল আকর্ষণের রঙ, কবির কল্পনায় লাল হৃদয়ের রঙও। লালের সঙ্গে নারীর আত্মিক সম্পর্ক। তাই তো নারীর সজ্জায় এতো লালের প্রাচুর্য, সিদুর, আলতা, কুমকুম, নখ পলিশ, লিপস্টিক সবই লাল।

নীল শাড়িকে *ভালোবাসার প্রতীক* হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তাই হয়তো মেয়েদের ভালোবাসা পাবার জন্য আকাশও নীল। মেঘ রঙ শাড়ি যে *বিরহের প্রতীক* তা কালিদাসের *মেঘদূতে* জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

বৈধব্য নারীর জন্য ভয়ংকর সেই আদিকাল থেকেই। এই অভিশাপের ছাপ দেয়া হয়েছে বিধবার পাড় ছাড়া, রঙ ছাড়া থান শাড়িতে। শাড়ির শাদা রঙ মনে করিয়ে দেয় স্বামী বিহনে তার জীবন অমনই শাদা, শূন্য, রিক্ত।

সুতি, সিল্ক, সিনথেটিক, সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ ও নকশার বৈচিত্রে শাড়ি সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে। পাড়ের কাজ, জমিনে কাজ, আচলে কাজ, সুতার কাজ, চুমকি ও জরির কাজ শাড়ির বিকাশে এবং বিন্যাসের শত ধারা। শিল্পী আর তাতি একাত্ম হয়ে রঙের বৈভব ছড়াচ্ছেন খোলে ও পাড়ে। এসব শাড়ির কোনোটি আভিজাত্যে গর্বিত, কোনোটি ফুলের রঙে স্নিগ্ধ, কোনোটি বুটি ও পাড়ে সমৃদ্ধ। নতুন নতুন নকশায় আকর্ষণীয়। পুরনোর প্রত্যাগমন ঘটলেও থাকছে নতুনের প্রতিফলন। শাড়ির এক ফ্যাশন দুইবার আসে না।

নানান নামের শাড়ি রয়েছে, যেমন মিরপুরের কাতান, ফিগার কাতান, ব্রোকেড কাতান, ডিনার কাতান, বার্মিজ কাতান, রাজশাহী সিল্ক, কাঞ্চুসিল্ক, জামদানি, টিসু কাতান, টিসু বেনারসি, টাঙ্গাইল তাত, আমেরিকান জর্জেট, ফ্রেঞ্চ জর্জেট, উলি শিফন, সলিড গোল্ড, পদ্মিনী কোলপুরি, ফেব্রিক প্রিন্ট, ব্রাশ প্রিন্ট, মণিহার, রাজশাহী গরদ, তসর ইত্যাদি।

ঢাকার মসলিন ছিল পৃথিবী বিখ্যাত। সর্বোৎকৃষ্ট সুতি বস্ত্র। বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যবসা কেন্দ্র *মুসল* থেকে *মসলিন* শব্দের উৎপত্তি। মসলিনের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতা পানির মতো বলে একে *শবনম* বা *ভোরের শিশির* নামেও ডাকা হতো। মসলিন সম্পর্কে একটি মুখরোচক গল্পের প্রচলন আছে – মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের কন্যা সাতটি মসলিন কাপড় এক সঙ্গে পরা সত্ত্বেও তাকে প্রায় নগ্ন দেখাচ্ছিলো। তাই তাকে সম্রাটের বকুনি খেতে হয়েছিল।

শাড়ির প্রয়োজন বাঙালির মননশীলতার জন্য। বাঙালি মন বাংলার নারীর কাছে ফিরে ফিরে শাড়িই অন্বেষণ করে। বিদেশি ললনাকে বাঙালি পরিবারে বধূ হিসেবে বরণ করে শাড়ি পরিয়ে।

ধর্মান্তরের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হয়েছে পোশাকের রূপান্তর। সুরুচি আর ঐতিহ্যে শাড়ি ঐশ্বর্যময়। স্কুলের কিশোরী কন্যার চড়ুইভাতিতে মায়ের শাড়ির বায়না ফুরিয়ে যায়নি আজো। প্রিয়তম মুহূর্তের সাজের জন্য বিদুষী তরুণীটি আজও শাড়িই বেছে নেয়। শাড়ির পরাভবের কোনো আশংকাই নেই। শাড়ি আমাদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত।

চট্টগ্রাম থেকে

ডারলিং

– লিটন

পান থেকে চুন খসলেই চায়নিজ কুড়াল দিয়ে কোপাবে অথবা ক্ষুর দিয়ে গালে পোচ দেবে একজন আরেকজনকে। রাতে পড়ালেখা হয় না, আসর বসে গাজা–ডাইলের। এই যখন কলেজ হস্টেলের ছাত্রদের চরিত্র তখন পৃন্সিপালের নির্দেশে হস্টেল বন্ধ করে দেয়া হলো। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী আমি। পরীক্ষা আসন্ন। নিয়মিত প্রাইভেট পড়ি বিজ্ঞানের প্রতিটা বিষয়েই। অতএব হস্টেলে সিট না থাকায় ভোগান্তিটা আমার জন্যই সবচেয়ে গুরুতর আকার ধারণ করলো।

কোনো উপায় না পেয়ে অবশেষে পাতি নেতা সুজনকে দিয়ে শহরের দুই নাম্বার হোটেল মিকোর তিন তলার আবাসিক দুইটা রুম আমরা ভাড়া করলাম কয়েকজনে। থাকার স্থান হলো। এবার চাই খাবার ব্যবস্থা। নিজেরাই রান্না করে এক সপ্তাহ পার করার পরে অনেক কষ্টে একজন কাজের বুয়া পেলাম। বয়স পঞ্চাশের উপরে। হালকা দেহ। দেখেই বোঝা যায় শরীরটা রোগাক্রান্ত। তবুও ঢেকি গেলা আর কি। বন্ধুরা সবাই নানি বলে সম্বোধন করলো।

নানি এক সময় শহরের নিষিদ্ধ এলাকার রাধারানী ছিল। আজ যৌবন এবং বয়স না থাকাতে কেউ তার কাছে যায় না। এ কারণেই সে বুয়ার কাজ বেছে নিয়েছে।

আমরা সব কিছু জানার পরও তাকেই রাখলাম। ধর্মভীরু সবুজ এবং ব্রাহ্মণ কমল অবশ্য আপত্তি করেছিল নানির রান্না খাবে না বলে। কিন্তু এক রকম বাধ্য হয়েই আমরা তাকে নিয়োগ দিলাম। নানিকে ডারলিং বলে ডাকতাম।

নানিকে অতীত কর্মের জন্য তওবা করানো হলো। নিয়মিত নামাজ পড়তো। জীবনে বিয়ে না হওয়াতে কোনো সন্তান তার নেই। তাই আমাদের খুবই যত্ন নিতো। আমরা সবাই মিলে নানিকে একটা নামাজের শাড়ি কিনে দিলাম। নানি তো খুবই খুশি।

নানি আমাকে বললো, *আমারে একটা তাতের শাড়ি কিনে দিবা। আমার এইটা মেলা দিনের আউশ।* বললাম, দেবো। এখন আমার বেশি টাকা নেই। তবে পরীক্ষার পর কিনে দেবো।

ভালোই কাটছিল দিনগুলো। লেক থেকে নানি কাপড় কেচে দিতো। রান্না এবং রুম পরিষ্কারের কাজগুলো ভালোই সুচারুভাবে সম্পন্ন করতো। হোটেলের পাশেই *রূপসী* সিনেমা হলে আমরা এক

টিকেটে দুই সিনেমা দেখতাম। নানি আমাদের বাধা দিতো। এরপর নানিকে অর্থাৎ আমার জীবনের প্রথম ডারলিংকে নিয়ে বাংলা সিনেমা দেখলাম। পান জর্দা কিনে দিতাম নিয়মিত।

দেখতে দেখতে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেল। বাড়ি চলে এলাম। হোটেলের রুমগুলো আমাদের জুনিয়র ছেলেদের দিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে নানির চাকরিটাও পারমানেন্ট করে দিলাম।

রেজাল্ট বের হলো তিন মাস পর। সবাইকে মিষ্টি খাওয়ানোর পর ডারলিং অর্থাৎ নানির কথা মনে হওয়াতে নানির জন্য একটা চারশ আশি টাকা দিয়ে শাড়ি কিনে নিয়ে দেখা করতে গেলাম। চমৎকার টাঙ্গাইলের তাতের শাড়ি ব্লাউজ পিসসহ। আকাশি রঙে হাতের কাজ করা শাড়িটা নিয়ে যেই হোটেলের তিন তলায় উঠলাম দেখি নতুন একজন বুয়া সবজি কাটছে। জিজ্ঞাসা করলাম আমার ডারলিং কই? আমি পাস করেছি। তার জন্য এই শাড়িটা নিয়ে এসেছি।

নতুন বুয়া চুপ হয়ে গেল। সে যা বললো তাতে আমি কাদলাম। চোখের পানি ঠিক বের হচ্ছিল না। তবে মনটা কেদেছিল ভীষণ। আমার ডারলিংকে আমার কেনা শাড়িটা দিতে পারলাম না।

নানির বস্তিতে গেলাম কবর জিয়ারত করার জন্য। কিন্তু আমি আরো হতবাক। নানি আগে পতিতা ছিল বলে নানিকে জানাযা এবং কাফনের কাপড় তো দূরের কথা, কবরও দেয়া হয়নি। তাকে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। যৌবনকালে যে মেয়ে হাজারো মানুষের মনোরঞ্জন করেছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর সময় তার পাশে কেউ যায়নি একটু সামান্য এক গ্লাস পানি নিয়ে।

যে নদী দিয়ে আমার ডারলিংকে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল সেই নদীতেই আমার কেনা শাড়িটা ঢিল দিলাম। একটু ভাসার পর শাড়িটা ভিজে তলিয়ে গেল নানির জীবনের মতো।

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ থেকে

একশ বছর

– বিউটি

আমার নানির বিয়ের শাড়িটা এখনো আছে। শাড়িটা প্রায় ষাট বছর আগের। খুব ছোটবেলায় এই শাড়িটার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল বেশি। নানিকে অনেক বুঝিয়ে নিয়ে আসি।

আজ নানি বেচে নেই। কিন্তু তার দেয়া সেই শাড়িটা আজো আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। শাড়িটা আমার স্মৃতি। হয়তো শতাব্দী পার করবে এই শাড়ি। সেদিন যদি বেচে থাকি তবে সবার কাছে গর্ব করে বলতে পারবো এটা একশ বছর আগের শাড়ি, আমার নানির বিয়ের শাড়ি।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, মধ্যপাড়া থেকে

আনন্দের কান্না

– মোহাম্মদ কামাল হোসেন হাবীব

মায়ের বিয়ের শাড়িটা আর কানপাশা জোড়া বিক্রি করে সেই টাকা নিয়ে বাবা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। তাও আবার কাউকে না জানিয়ে। মায়ের বিয়ের শাড়ি, অথচ তার কাছে একটু বলারও প্রয়োজন বোধ করলেন না বাবা। শুনেছি বাবা যাওয়ার সময় একটা চিরকুট লিখে রেখে গিয়েছিলেন, *শাড়ি ও গহনার জন্য দুঃখ করো না, দেশ স্বাধীন হলে এ রকম হাজারো শাড়ি ও গহনা পরতে পারবে।* চিরকুটটা মা পেয়েছিলেন আমার দাদির পানের সাজিতে।

বাবার সঙ্গে আমাদের গ্রামের পাচ ছয়জন গিয়েছিল। যুদ্ধের পর তারা কেউ বিচ্ছিন্নভাবে ফিরে এলেও আমার বাবার আর আসা হয়নি।

যতোদূর মনে পড়ে আমি তখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি। আমার বড় বোনটা ক্লাস সেভেনে আর ছোট বোনটা কেবল বাবা–মা ডাকতে শিখেছে।

এরপর শক্ত হাতে সংসারের হাল ধরলেন মা। বাবা যেটুকু জমি রেখে গিয়েছিলেন তাতে আমাদের *নুন আনতে পান্তা ফুরোয়* অবস্থা। কিন্তু মায়ের বিচক্ষণতা আমাদের টের পেতে দেয়নি। অনেক দিন রাতে দেখেছি আমাদের খাইয়ে–দাইয়ে মা প্রদীপটা নিভিয়ে শুয়ে পড়েছেন। একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মা, তুমি তো ভাত খাওনি, ভাত খাবে না?

হ্যা, আমি তোদের খাওয়ার আগেই খেয়ে নিয়েছি। এখন ঘুমো তো, মায়ের বিরক্তি সূচক উত্তর শুনে ঘুমিয়ে যেতাম।

তারপর অনেক দিন পরের কথা। আমার বড় বোনটার বিয়ে হয়েছে। একদিন ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর এলো, ওর শাশুড়ির নাকি খুব অসুখ। এখন মাকে তো যেতেই হয়।

জামাইবাড়ি যাওয়ার মতো ভালো কোনো শাড়ি মায়ের ছিল না। তাই আমার একমাত্র চাচির কাছে গিয়েছিলেন তার একটা শাড়ি আনতে। চাচি মাকে কি বলেছেন জানি না। ও ঘর থেকে এসে মা অঝোর ধারায় কিছুক্ষণ কেদেছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, চাচি কি বলেছেন?

মায়ের মুখ ছিল নীরব।

সেদিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার প্রথম উপার্জনের টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবো। সংসারের অনেক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে মা আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

এক সময় বিএ পাস করলাম। হন্যে হয়ে চাকরি খুজছি। কিন্তু চাকরি নামের *সোনার হরিণ*–টার নাগাল না পেয়ে টিউশনি শুরু করেছিলাম। প্রথম মাসে তিনটি টিউশনিতে প্রায় ষোলশ টাকার মতো পেলাম। পুরো টাকাটা দিয়েই মায়ের জন্য একটি কাতান শাড়ি কিনলাম।

শাড়িটা পেয়ে শাড়িসহ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিছুক্ষণ কাদলেন। আমিও কান্না সংবরণ করতে পারিনি। নবজাতক শিশুর কান্না যেমন আনন্দের, সেদিন শাড়িটা পেয়ে আমার মায়ের সেই কান্নাও ছিল আনন্দের।

মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর থেকে

অপরাধ

১৯৯০–এর ফেব্রুয়ারি। এইচএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার প্রায় চার পাচ মাস পর বাড়ি যাচ্ছি। মায়ের জন্য দুটো শাড়ি, ছোট্ট ভাইটির জন্য শার্ট–প্যান্ট আর নগদ বারো হাজার টাকা সঙ্গে আছে। টানাটানির সংসার আমাদের। মুক্তিযোদ্ধা বাবার মৃত্যুর পর সংসারকে মা টেনে নিচ্ছেন কোনোমতে। বলা চলে সংসারের একমাত্র আয়ের উৎস আমার টিউশনির টাকা।

ছোটবেলা থেকেই মেধার জন্য প্রশংসিত হয়েছি। ক্লাস ফাইভ ও এইটে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পাওয়ার পর গ্রামের এক শিক্ষা অনুরাগী চাচার সহযোগিতায় তারই বড় ভাইয়ের বাসায় লজিং শর্তে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তির সুযোগ হয়। চাচার একমাত্র মেয়ে নীলা আমার দুই ক্লাস জুনিয়র। সুন্দরী ও মেধাবী হিসেবে এলাকায় কারো কারো ঈর্ষার পাত্রী। তাকে পড়ানো ছাড়াও আরো দুটি টিউশনি করে মাকে পাঠাতাম প্রতি মাসে। অবশেষে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে মেধা তালিকায় স্থানসহ উত্তীর্ণ হলাম। চাচার পরামর্শ উপেক্ষা করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম। উদ্দেশ্য, ক্লাস করার বাধ্যবাধকতা যেহেতু কম সেহেতু রোজগারের দিকটা বিবেচনা করা যাবে। যাত্রাবাড়ির একটা মেসে থেকে টিউশনি ছাড়াও একটা পার্টটাইম কাজ করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগলাম। পরীক্ষার রেজাল্ট এবারও ভালো। তবে সিরিয়ালটা একটু পেছনে নেমে গেল।

যেদিন রেজাল্ট হলো সেদিন প্রচণ্ড কেদেছি। সবার কি আনন্দ। অথচ স্রেফ টাকার অভাবে বন্ধু–বান্ধবদের থেকে কিছুটা দূরে সরে আছি। ইতিমধ্যে নীলার একটি চিঠি পেলাম যার সারকথা ছিল যে ডিভি লটারির বদান্যতায় সে তার বাবা–মায়ের সঙ্গে আমেরিকা চলে যাচ্ছে, আমি যেন একবারের জন্য হলেও দেখা করি। অবশেষে দীর্ঘ দিন পর চট্টগ্রাম হয়ে বাড়ি যাচ্ছি মায়ের কাছে। আগেই চিঠিতে মাকে সম্ভাব্য তারিখ জানিয়ে চিঠি লিখেছি।

তারপর আমার জীবনটা ওলোট–পালোট হয়ে গেল। বাস থেকে নামার আগেই পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম, হালিশহরের যে এলাকায় নীলাদের বাসা সেখানে আওয়ামী–বিএনপি সংঘর্ষে দুই দলের প্রায় চারজন মারা যাওয়ায় গ্রাম ও কলোনির মধ্যে উত্তেজনা চলছে।

বিকাল আনুমানিক পাচটা। রিকশায় কতো দূর যাওয়ার পর হঠাৎ একটা জটলা থেকে চার পাচজন সশস্ত্র যুবক এগিয়ে এসে টেনে রিকশা থেকে নামিয়ে নির্বিচারে মারতে শুরু করলো। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে করতে একটা ছেলে ধারালো কিরিচ বের করে তলপেটে আঘাত করলো।

জ্ঞান হারানোর আগে কেবল এটুকুই শুনলাম, শালা, বিএনপির দালাল, শালারে কাইট্যা ফালা।

পরদিন জ্ঞান ফিরে দেখি চট্টগ্রাম মেডিকালে চিকিৎসাধীন। পকেটের টাকাগুলো ছাড়া সবই ঠিক আছে। মাসখানেক পর সুস্থ হয়ে নীলাদের বাসায় গেলাম। আমাকে দেখে সবাই একটু বেশি রকম নীরব হয়ে গেল। সন্দেহ বাড়তে লাগলো। পরদিন একাকী ডেকে নীলাই জানালো চরম দুঃসংবাদটি। নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস পরেও বাড়ি না যাওয়ায় মা চিন্তিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। গত সপ্তাহে মা চলে গেছেন পরপারে। শোকে পাথর হয়ে বাড়ি গেলাম। সপ্তাহখানেক থেকে ছোট ভাইকে নিয়ে ফিরে আসার পথে আবারও নীলার সাক্ষাৎ। জিজ্ঞাসা করলো এখন কি করবেন, কোথায় যাবেন?

বললাম, অনিশ্চিত যাত্রা শুরু হলো আমার।

প্রচণ্ড এক নাড়া খেলাম নীলার চোখে কান্না দেখে। সে বললো, আপনি তো কখনো কিছু শুনতে চাইলেন না।

তার কাধে হাত রাখতেই সে আরো হাউমাউ করে কেদে উঠলো।

বললাম, নীলা, তোমাকে কষ্ট দেবো না ভেবেই তোমার মনের অবস্থা জেনেও নীরব ছিলাম। সরি, কোনো পিছু টানে আমাকে জড়িও না।

পরদিন মায়ের জন্য কেনা শাড়ি দুটোর একটি তার হাতে তুলে দিয়ে বললাম, যতোদিন আমার জন্য অপেক্ষা করতে পারবে ততোদিন এই স্মৃতিটুকু আগলে রেখো।

তারপর ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক হয়ে যেতে লাগলো।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইকনমিক্সে ভর্তি হলাম। প্রথম প্রথম টিউশনিই ছিল আয়ের উৎস। এক পর্যায়ে মেসের এক বড় ভাইয়ের পরামর্শে প্রতিদিন বিকেলে ভাড়ায় বেবিট্যাকসি চালানো শুরু করলাম। এদিকে ক্রমেই ক্লাস ফাকির সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো। বিষয়টা সহপাঠী অনন্যার দৃষ্টি এড়ায়নি। এর আগে সে অনেকবারই জানতে চেয়েছিল কেন ক্লাসে আমি এতো নীরব ও উদাস থাকি। দুই একদিন টিপ্পনিও কেটেছে। আমল দিইনি। এভাবেই শেষ করলাম তিন বছর। তারপর অনার্স শেষ করে রেজাল্টের অপেক্ষা। অবসরে আমিও ব্যস্ত হয়ে পড়লাম রোজগারে। রেজাল্টের টেনশনও মাথায় আছে। তবে ক্যাম্পাসে যাওয়া হয় না।

একদিন উত্তরার আজমপুরে অলসভাবে বেবিট্যাকসিতে বসে আছি। মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলার ডাকে পেছনে তাকিয়েই বিব্রত হয়ে পড়লাম। ভদ্রমহিলার পাশে অনন্যা দাড়িয়ে আছে অপলক চোখে। চিৎকার করে বললো, তুমি! মা, ও আমাদের ফোর্থ বয়।

আমিও অবাক। জিজ্ঞাসা করলাম, রেজাল্ট কবে হলো?

বললো তোমাকে সবাই হন্যে হয়ে খুজছে।

কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে? ওঠো।

মগবাজারে তাদের বাসায় গেলাম। অনেক কথার মাঝে তার বাবা কিছুটা করুণার সুরে তার অফিসে চাকরির প্রস্তাব দিলেন।

ফেরার সময় অনন্যা এগিয়ে এসে বললো, এই তোমার নীরবতার রহস্য!

উত্তরে বললাম, আরো কিছুদিন এভাবে থাকতে চাই। কাউকে কিছু না বলার অনুরোধ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

এভাবে আরো এক বছর কেটে গেল। মাস্টার্স পরীক্ষার মাসখানেক আগে অনন্যা একটা ব্যাগ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, বাসায় গিয়ে খুলবে।

সন্ধ্যায় খুলে দেখলাম, একগাদা নোট, সাজেশন, কলম ও কয়েক গোছা ফুল। সঙ্গে একটি চিরকুট। তাতে লেখা –

বন্ধু, তোমার কষ্টের পথে করুণা করছি না। তোমার মেধার মূল্যায়ন চাইছি। তোমার জীবন সংগ্রামে আমি তোমার ভালোবাসার সঙ্গী হিসেবেই থাকবো।

পরীক্ষার শেষ দিন অনন্যা জোর করে নিয়ে গেল সিলভানায়। পকেটে তিনশ টাকা গুজে দিয়ে বললো, এ হলো আজকে সারাদিনের তোমার হালাল রোজগার। আর কোনো কথা নয়।

নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। সেও কেদে ফেললো। সারাদিন তার সঙ্গে আড্ডা দিলাম ক্যাম্পাসে। চার মাস পর রেজাল্ট হলো। এবার সপ্তম। রেজাল্টের দিন অনন্যার সঙ্গে আবার দেখা। সেদিন ইচ্ছা করেই সময় দিলাম। বিকেলে মল চত্বরে দাড়িয়ে মুখোমুখি হয়ে সে আমার ডান হাত মুঠোয় ভরে তার চিঠির উত্তর জানতে চাইলো। অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললাম, একজন আমার অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

বললো, কে?

আমি নীলার কথা বললাম।

সে জিজ্ঞাসা করলো গত কয়েক বছরে তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে কি না।

বললাম, কোনো যোগাযোগ নেই। তবে এটি আমার বিশ্বাস।

অনন্যা দরদর করে কাদতে লাগলো।

সে চলে যাওয়ার পর নিজেকে বড় একা মনে হলো।

ছয় সাত মাস পর একদিন রাতে কাজ থেকে ফিরে এসে খেতে বসলাম। ছোট ভাই বললো, সকালে নীলাদিদি এসেছে তার স্বামীসহ। দেশে এসেছে তিন মাস আগে। অনেক কষ্ট করে, খুজে ঠিকানা ম্যানেজ করে এসেছে। সারাদিন অপেক্ষা করে চলে গেছে। একটা চিঠি দিয়ে গেছে। পরদিন তার সঙ্গে দেখা করলে কেবল সরি বলেই কেদে ফেললো। বুঝতে বাকি রইলো না কিছু। ফিরে এলাম।

সারাদিন আর কাজে বের হয়নি। দুপুরে আরেকটা চিঠি এলো ডাকে। অনন্যার চিঠি। সে লিখেছে –

তোমার নীরবতা ভাঙবো না। শুধু একটা অনুরোধ, তুমি নিজ হাতে তোমার ভালোবাসার ফুলটি ছিড়ে ফেলতে এসো একবার।

সঙ্গে তার বিয়ের কার্ড।

বড় অসহায় হয়ে গেলাম। শীতকাল। মগবাজারে অনন্যাদের বিশাল বাড়িতে মহাধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন চলছে। বিয়ের দিন দুপুর বারোটার দিকে হাজির হলাম। অনন্যার মা কদর করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ডেকে নিলেন অনন্যার ঘরে যেখানে বান্ধবীদের পরিবেষ্টনিতে অনন্যা বধূর সাজে বসে আছে।

আমাকে দেখেই উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তার হাতে বাক্সটা তুলে দিয়ে বললাম, এটি আমার মায়ের স্মৃতি বিজড়িত ভালোবাসার দ্বিতীয় ও শেষাংশ। এর যত্ন করো।

হঠাৎ সবাইকে বোকা বানিয়ে সে তখনই বাক্সটা খুলে ফেললো। শাড়িটা বের করতেই ভেতরের ছোট চিরকুটটি বেরিয়ে এলো। ওই চিরকুটে নীলার আগমন সংবাদ লিখেছিলাম। আমি ভাবতেই পারিনি এমন কাণ্ড সে করে বসবে।

চিৎকার দিয়ে মাকে ডেকে সে বলে উঠলো মা, আমি এ বিয়ে করবো না। এক্ষুণি তাদেরকে না করে দাও। বলেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাদতে লাগলো। ঘটনার আকস্মিকতায় বোকা হয়ে গেলাম।

কোনো মতে কান্না সংবরণ করে বললাম, অনন্যা আমি আমার ভাগ্যের কাছে আমি বড্ড পরাজিত, কেদে লাভ নেই। দোষ না আমার, না তোমার। সব ঠিক হয়ে যাবে।

দ্রুত স্থান ত্যাগ করলাম। খাওয়াও হলো না। ঘরে এসে সারাদিন কেদে হালকা হলাম।

এখন আমি একটি মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে চাকরিজীবী। চাকরি থেকে প্রাপ্ত আয় আর দুটো ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে যা পাই তাতে দুই ভাই সচ্ছলভাবে চলছি। বরং প্রতি মাসে চার পাচ হাজার টাকা বাড়তি থেকে যায়। সেগুলো জমা করছি ছোট ভাইয়ের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে।

মাঝে মাঝে ভাবি, গত বারো বছরে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি দুদলই তো ক্ষমতায় গেল। কতো সন্ত্রাসী ও গুন্ডাপান্ডা ভাগ্য পরিবর্তন করে নিল। অথচ তাদেরই রোষানলে পরে আমার নিরপরাধ জীবনটা তছনছ হয়ে গেল।

কি অপরাধ ছিল আমার?

উত্তর খুজে পাই না।

আর খুজবো না উত্তর।

এখন কেবল অপেক্ষা।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দুই টাকার

– মোহাম্মদ এনামুল হক

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে খুলনা শিপইয়ার্ডে প্রথম চারিতে যোগ দিই। জীবনের প্রথম বেতন পচিশ টাকা তুলে প্রথম খরচ করেছিলাম মায়ের জন্য দুই টাকা দামের শাড়ি। বাড়িতে গিয়ে নিজ হাতে মাকে পরিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছিলাম তার মুখখানি। কতো যে মধুর লেগেছিল। এখন আমার বেতন প্রায় বারোশ টাকা। অনেক শাড়ি কেনার সামর্থ আমার আছে। কিন্তু আমার মা বেচে নেই।

চিরির বন্দর, দিনাজপুর থেকে

রজত জয়ন্তী

– আনোয়ার আলী

পচিশ বছর আগে রেবার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয় তখন তার বয়স মাত্র ষোল। সবেমাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। বিয়ের সময় উল্লেখ করার মতো তার নিজস্ব কোনো শাড়ি ছিল না। কিন্তু শাড়ির খুব শখ রেবার।

আমি একজন সামান্য চাকুরে। আমার স্বল্প আয় আর প্রয়াত পিতার পেনশনের টাকা দিয়ে শহরের উপকণ্ঠে সাধারণ এক বাসাবাড়িতে ছিল আমাদের অভাবের সংসার। আমি ছিলাম বাড়ির বড় ছেলে। স্কুল ও কলেজগামী চার ভাইবোনের লেখাপড়ার খরচ যোগাতেই তখন আমার প্রাণান্তকর অবস্থা। তাই সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। তবুও বিয়ের প্রথম প্রথম নবপরিণীতা স্ত্রীর ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে লুকিয়ে তাকে কয়েকটা শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম। নতুন শাড়ি পাবার আনন্দে তার সুন্দর মুখখানি আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলেও নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কায় পরক্ষণই তা

আবার মলিন হয়ে উঠতো। স্বামীর কাছ থেকে এভাবে পাওয়া শাড়ি পরে একান্নবর্তী পরিবারে শাশুড়ি ও সমবয়সী দুই ননদের সম্মুখীন হওয়া তার পক্ষে ছিল এক চরম বিড়ম্বনার অভিজ্ঞতা।

আমাদের প্রথম বিয়েবার্ষিকীর দিনটির কথা এখনো মনে আছে। আগের দিন রেবার জন্য একটা শাড়ি কিনেছিলাম। প্রোগ্রাম ছিল, সেদিন সন্ধ্যায় বাইরে যাবো এবং চায়নিজ রেস্তোরায় রাতের আহার পর্ব সেরে ঘরে ফিরবো। সেই মতো বিকেলবেলায় সে সাজগোজ করতে থাকে। রেবার পরনে নতুন শাড়ি দেখে আমার ছোট বোন বললো, ভাবী, এ শাড়ি কোথায় পেলে, ভাইয়া বুঝি কিনে দিয়েছে?

হ্যা, তোমার ভাইয়ার কাণ্ড দেখো। তোমাদের জন্য না কিনে কেবল আমার জন্য কিনেছে। আমার খুব খারাপ লাগছে।

ভাবী, আমি বুঝি তাই বলেছি! আমরা কি শাড়ি পরি? আমাদের কি তোমার মতো বিয়ে হয়েছে?

আড়াল থেকে কথাগুলো শুনে নিজেকে অপরাধী মনে হলো। তারপর যখনই স্ত্রীর জন্য শাড়ি কিনেছি তখন মা, ভাইবোনদের জন্যও কিছু না কিছু কিনেছি। এতে আমার কষ্ট হয়েছে ঠিক কিন্তু সবার মুখে হাসি ফোটাতে পেরে আনন্দও পেয়েছি অনেক।

এরপর একে একে পচিশটি বছর পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে স্নেহময়ী মা গত হয়েছেন। ভাইবোন সবার বিয়ে হয়ে গেছে। সকলেই মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। আমি কেবল পৈতৃক বাস্তুভিটেটা আগলে পড়ে আছি। এখন আর আগের মতো স্ত্রীর জন্য শাড়ি কেনা হয় না। তার সঙ্গে বাইরেও বড় একটা বের হই না। সে শাড়ি নিজেই কেনে।

রেবার সেই সব পুরনো শাড়িগুলো আজ আর নেই। তবু আমি জানি, নতুন শাড়ির ভিড়ে একটা শিফন শাড়ি সে আজো সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে। বিয়ে ঠিক হওয়ার পর একটা কাজে টিসিবি অফিসে গিয়েছিলাম। সেখানে নির্ধারিত দরে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত শিফন শাড়ি বিক্রি হচ্ছিল। অনাগত বধূর জন্য সেখান থেকে এই শাড়িটা কিনেছিলাম এবং বাসর রাতে সেটি তার হাতে তুলে দিই। আয়ত দুটি চোখ মেলে সলজ্জ ভঙ্গিতে সে গ্রহণ করেছিল আমার উপহার। পরদিন বিকেলে দেখি, নববধূ সেই শাড়িটা পরে শয্যায় রাজেন্দ্রানীর মতো বসে রয়েছে। আমার মনে হলো, জানালা দিয়ে প্রতিফলিত অস্তায়মান সূর্যের আলোকচ্ছটা, তার চন্দনচর্চিত গৌর মুখমণ্ডল আর সেই শিফন শাড়ির গাঢ় বেগুনি রং মিলেমিশে একাকার হয়ে যেন এক দেবীর আগমন হয়েছে আমার পর্ণকুটিরে।

কয়েকদিন পর আমাদের বিয়ের রজত জয়ন্তী। রেবা এই উপলক্ষটি স্মরণীয় করে রাখতে চায়। সে আমাকে একটা সুন্দর জিনিস উপহার দেবে বলে জানিয়েছে। তার মনোভাব বুঝতে পারি। কথা দিই, সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে এক সঙ্গে নিউ মার্কেটে যাবো এবং তার পছন্দসই একটা শাড়ি কিনবো।

কিন্তু অফিসের কাজে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ায় সন্ধ্যাবেলার কথাটি আমি বিস্মৃত হই। এক বন্ধুর বাড়িতে আড্ডা দিয়ে রাত দশটায় যখন বাসায় ফিরি তখন দেখি সে সেজেগুজে গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে। মুখখানা আষাঢ়স্য মেঘের মতো কালো। বুঝতে পারি সর্বনাশ হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে হাত দুইখানা ধরে বলি, রেবা, আমি খুবই দুঃখিত। আমার একেবারে মনে ছিল না। কাল দেখো আর ভুল হবে না।

সে এক ঝটকায় তার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, খবরদার, আমাকে ছোবে না। তুমি মিথ্যা বলছো। তোমাকে বিশ্বাস করি না।

রেবাকে যতো বোঝাই সে ততোই রেগে ওঠে। শেষমেষ এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলি, চুপ করো, অনেক হয়েছে, বুড়ো বয়সে আর নাটক করতে হবে না।

বুড়ো হয়েছো তুমি, আমি না। তার কণ্ঠে তীব্র শ্লেষ।

রেবার কথায় যুক্তি আছে। রেবা যথেষ্ট ফিগার সচেতন। ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত মেয়েটাকে নিয়ে যখন বাইরে যাই তখন মা-মেয়ে বলে তাদেরকে আলাদা করে চেনা মুশকিল। আর কোনো কথা না বলে চুপ থাকি। রেবা কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে। তারপর কথা বন্ধ। বিয়ের রজত জয়ন্তী শিকেয় উঠলো।

সপ্তাহ খানেক পর একদিন সকালে বিদ্যুৎ বিলের ফাইল খুজতে গিয়ে আলমারির এক কোণা থেকে বেগুনি রঙের সেই শিফন শাড়িটা বেরিয়ে এলো। শাড়িটা দেখে আনমনা হয়ে পড়ি। এর ভাজে ভাজে অনুভব করতে থাকি প্রথম ভালোবাসার সৌরভ।

কিছুক্ষণ পর টের পাই রেবা চুপিসারে আমার পেছনে এসে দাড়িয়েছে। তার মুখোমুখি হই, বোকার মতো হাসি।

না, তুমি দেখছি বুড়ো হওনি। রেবা বললো। তার ঠোটে দুষ্টামির হাসি।

এক হাতে তার কোমর জড়িয়ে কাছে টানি অন্য হাতে দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ সেই শাড়ির আচল। বললাম, এসো। আজ আমাদের বিয়ের রজতজয়ন্তী পালন করি।

খুলনা থেকে

আকাশ প্রদীপ

– জাকির

কেউ খ্যাতি অর্জন করে বিদ্যায়, কেউ বা ব্যবসায়। কিন্তু আমার বড় ভাইয়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ভবঘুরে হয়ে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যাবতীয় কাজ সেরেই ভাইয়া বেরিয়ে পড়তেন অজানার উদ্দেশে। বাসা থেকে বের হওয়ার সময় মনে হতো ভাইয়া ভীষণ ব্যস্ত কোনো কাজের উদ্দেশে বের হচ্ছেন। মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর দুপুরে ফিরে খেয়ে দেয়ে একটা ঘুম। আবার সন্ধ্যায় বের হওয়া ও রাতে ফেরা। ভাইয়ার এই ধরনের ভবঘুরে জীবন আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনকে করেছিল ভীষণ বিষণ্ন। বাবার হয়েছিল হাইপারটেনশন। মায়ের চোখের নিচে পড়েছিল কালি। আমি আর আমার ছোট বোন পড়তাম বাবার কাছে। আমাদের রেজাল্টও ছিল ভালো। তাই বাবার স্বপ্নের ভিতটা তৈরি হয়েছিল আমাদের দুজনকে নিয়ে।

এদিকে ভাইয়া এক কাণ্ড করে বসলেন। অনেকটা সিনেমার কাহিনীর মতো এক মেয়েকে বিয়ে করে বাসায় এসে উপস্থিত। বাসায় সেদিন শুরু হয়েছিল কেয়ামত।

বৌকে ফেলে ভাইয়া সেদিন পালিয়েছিলেন। নতুন ভাবী সেদিন তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই পাননি। ভাবীর কান্না দেখে সেদিন মন খারাপ হয়েছিল। তবুও এটা বুঝেছিলাম যে, ভাবী একটা মস্তবড় অপরাধ করেছেন। এরপর ভাবীর অমায়িক ব্যবহারে সবার মন ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। সবারই

অলক্ষ্যে ভাবী হয়ে ওঠেন সংসারের নির্ভরযোগ্য অংশ। এতো কিছুর পরেও বিয়ের পর পাচ মাস ছিল আমাদের আর্থিক কষ্টের। বাবা ঠিক কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না।

সংসারে শনির দৃষ্টি এক সময় যায় ঘুরে। ভাইয়া একটা চাকরি পান। বেতন সাত হাজার টাকার মতো। আমাদের পুরো ফ্যামিলি যেন অন্ধকার থেকে আলোতে এসে পড়ে। বাবার চিন্তাযুক্ত মুখটি ভরে ওঠে হাসিতে।

মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন ভাইয়া প্রথম বেতনের টাকা দিয়ে আমার জন্য একটা শার্ট, বাবার জন্য পাঞ্জাবি, সুপ্তির জন্য জামা আর মা ও ভাবীর জন্য কিনে এনেছিলেন শাড়ি। এবং বাকি টাকা বাবার হাতে আনন্দের অশ্রুসজল চোখে তুলে দিয়েছিলেন।

বাবা আমার সেই ভবঘুরে ভাইটিকে আনন্দে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। সত্যিই জগতের সমস্ত সুখ সেদিন বাবার কাছেই ছিল। আমি আমার শার্ট পরে ভাইয়ার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। শুনতে পেলাম ভাইয়া ভাবীকে বলছেন শাড়িটি পরে আসতে।

ভাবী বললেন পরে পরবেন। ভাবী শাড়ি পরে প্রথমে আমাকে বললেন, কেমন হয়েছে দেখো তো। বললাম, মা দেখে যাও, ভাবীকে নতুন শাড়িতে কতো সুন্দর লাগছে। এমন সময় বাবার অফিস থেকে কয়েকটা লোক এসে পরে। ভাবী তাই তাড়াতাড়ি শাড়ি চেঞ্জ করে চা নাশতা রেডি করতে যান। ফলে শাড়ি পরা অবস্থায় আর ভাইয়ার সামনে গিয়ে দাড়াতে পারেননি। এরপর আর কখনো সেই শাড়িটি ভাবীর পরা হয়নি। সময়ের ব্যবধানে ভাইয়া চাকরি থেকে সুযোগ পেয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য চলে যান জাপান।

এক বছর পর ভাইয়ার ফেরার কথা ছিল। যাওয়ার তিন মাস পর ভাইয়া একটা চিঠি দিয়েছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন আমাদের কথা, টাকাও পাঠিয়েছিলেন অনেক। কিন্তু বছর শেষে যখন ভাইয়ার অফিসের সবাই ফিরে এলেন জাপান থেকে ভাইয়া ফিরলেন না। এরপর অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। প্রায় ছয় বছর। ভাইয়ার কোনো চিঠিও আসে না চার বছর যাবৎ।

তবুও আমার, আমার বৃদ্ধ বাবা ও মায়ের প্রতীক্ষা ভাইয়া কবে ফিরবেন? আজ অনেক বড় হয়েছি, বুঝতে শিখেছি, এমনকি অনুভব করতেও শিখেছি।

দেখেছি যখন গভীর রাতে আকাশে জ্বলছে মিটিমিটি তারা তখন ভাবী দাড়িয়ে তাকিয়ে আছেন জানালা ধরে আকাশের পানে। চোখে তার প্রতীক্ষার প্রহর।

হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম সেই শাড়িটি ভাবী পরেছেন। পেছন থেকে বাবার হাত আমার কাধের ওপর পড়লো। তখন আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না। ভাবীকে দেখিয়ে বাবাকে বললাম, জানো বাবা, ভাবীর ওই শাড়িটি ভাইয়ার প্রথম বেতনের টাকা দিয়ে কেনা।

আমাদের উপস্থিতি ভাবী লক্ষ্য করেননি। ভাবী তখনো তাকিয়ে ছিলেন আকাশ প্রদীপগুলোর দিকে।

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকাল কলেজ থেকে

মেরুন কালার

– তারিক শাম্মন

রোজার মাস, ইউনিভার্সিটি বন্ধ। ভাবলাম সময়টা কাজে লাগানো দরকার। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম মিমি সুপারমার্কেটে চাচার শাড়ির দোকানে বসবো। এগারো রোজা থেকে আমি, চাচাতো ভাই আওলাদ আর খালোতো ভাই জাবেদ দোকানে বসা শুরু করলাম।

সেলসম্যানসহ মোট সাতজন হলাম। রোজার দিন বলে সকালে কাস্টমার কম থাকতো। আমরা বিরস মুখে দোকানে বসে গল্প করতাম। সেলসম্যান একজনের নাম ছিল জানে আলম। হুজুর মানুষ। মুখে ছাগলদাড়ি। আমরা প্রায় সময়ই জানে আলমের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠতাম।

প্রথম দিন জানে আলমের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন চলছে ভাই।

জানে আলম বললো, আর বইলেন না ভাই। এই পবিত্র রমজান মাসে দোকানদারি কইরা ইমান নষ্ট।

আওলাদ বললো, কেন কি হয়েছে?

জানে আলম বললো, বেশরিয়তি কারবার ভাই, বোরখা তো পরেই না কতোগুলা মহিলা এমন সব পাতলা শাড়ি পইরা আসে যে চোখের রোজা নষ্ট।

জানে আলম এমনিতে গম্ভীর প্রকৃতির লোক। অথচ অবাক হয়ে খেয়াল করলাম মহিলা কাস্টমার এলেই সে কেমন যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তার কর্কশ গলা হয়ে যায় কোকিলের মধুর কণ্ঠ। জানে আলম গায়ে শাড়ি জড়িয়ে মহিলাদের দেখান। সারা দিন জানে আলমকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমাদের সময় কাটে। তবে চার পাচ দিনের মধ্যেই জানে আলম আমাদেরকে নানান ট্রেনিং দিয়ে লায়েক বানিয়ে ফেললো। যে কাজকে পৃথিবীর অন্যতম কঠিন কাজ বলে মনে হতো সেই শাড়ি ভাজ করাও শিখে ফেললাম।

আঠারো উনিশ রোজার দিকে জানে আলমের জায়গায় আমরাই মূল নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলাম। আমরাই শাড়ি দেখাই। ভালোভাবে দেখতে চাইলে লম্বু জাবেদকে শাড়ি পরিয়ে দিই। কোড নাম্বার দেখে দাম বলি। তারপর বিক্রি করে ফেলি। জানে আলম বসে বসে রেস্ট নেয়। চোরা চোখে মহিলাদের দিকে তাকায়। এতে বোধহয় তার ইমান নষ্ট হয় না।

ইফতারের পরই মার্কেট বেশি জমে উঠতো। একদিন এক মহিলা আর তার মেয়ে শাড়ি কিনতে ঢুকলো। মেয়েটা অপূর্ব সুন্দরী। মেয়ে যতো না সুন্দরী, মা তারচেয়ে বেশি সুন্দরী। তবুও বয়সের দিক বিবেচনায় মেয়ের দিকেই আকৃষ্ট হলাম। একটার পর একটা শাড়ি দেখিয়ে যাচ্ছি। যে জাবেদ শাড়ি পরাটা প্রথম দিকে খুব এনজয় করতো সেই জাবেদও একটার পর একটা শাড়ি পরতে পরতে ত্যক্ত–বিরক্ত। তবে আমি খুশি। শাড়ি কিনতে যতো দেরি হবে মেয়েটাকে ততো বেশি দেখতে পারবো।

হঠাৎ মা বলে উঠলেন, দেখ তো নীলা, ওই কালারেরটা কেমন হবে?

জেনে ফেললাম মেয়ের নাম নীলা।

নীলা বললো, ভাই, ওই মেরুন কালারের শাড়িটা নামান তো।

মেরুন, ম্যাজেন্টা, পেস্ট এই কালারগুলো নিয়ে আমার মধ্যে বড় ধরনের বিভ্রান্তি রয়েছে। তাই অন্য একটা নামিয়ে আনতেই নীলা মেয়েটা বললো, কি সেলসম্যানগিরি করেন, মেরুন কালারই চেনেন না।

আমিও চামে বলে ফেললাম, আপা, আমি আসলে স্টুডেন্ট। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। প্রফেশনাল না তো, এ জন্য সমস্যা হচ্ছে।

নীলা বললো, ইউনিভার্সিটিতে পড়লে বুঝি মেরুন কালার চেনা যায় না।

এ কথা শুনে মনে হলো যেন শূন্য রানে বোল্ড আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরছি। অবশেষে জানে আলম এসে সালাম দিল। আঠারো হাজার টাকায় একটা নীল রঙের শাড়ি বিক্রি হলো। তবে ওই দিন মেরুন রঙ ভালোভাবে চেনা হয়ে গেল।

রাতে স্বপ্নে দেখলাম নীলা এসেছে। পরনে মেরুন কালারের শাড়ি। আমার পরনে পাঞ্জাবি। দুজনে পাশাপাশি হাটছি। হঠাৎ সেহরির কড়া সাইরেন। রোমান্টিক স্বপ্নের এখানেই ইতি। ভাবলাম স্বপ্নে তো কালার দেখা যায় না, কালার দেখলাম কিভাবে! মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

পরদিন দোকানে নীলা ও তার মাকে দেখে আমি অবাক, দেখা গেল শাড়িটাতে একটা ডিফেক্ট আছে। সমস্যা হচ্ছে নীল রঙের এই শাড়ি আর নেই। কিন্তু এই শাড়িটাই তাদের লাগবে। জানে আলম তাদের খোজ রাখতে বললো। দোকানের ফোন নেই। তাই আমার মোবাইল নাম্বার দেয়া হলো।

প্রায় প্রতিদিনই মোবাইলে কল আসে। নীলাই কথা বলে। কিন্তু তখনো শাড়ি আসেনি। একদিন বললাম, আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন?

নীলা বললো, না তো!

বললাম, আমি তারিক। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ওই মেরুন কালার।

নীলা বললো, হ্যা, চিনতে পেরেছি।

অবশেষে নীল কালারের শাড়িটা এসেছে। আমিই কল করলাম। নীলা শাড়ি নিতে এলো। নীলাকে একটা দামি ঈদ কার্ড গিফট দিলাম।

কয়দিন আগে বৈশাখী মেলায় জমজমাট চট্টগ্রামের ডিসি হিল। সব মেয়েই বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে এসেছে। একমাত্র আমার পাশের মেয়েটি মেরুন কালারের শাড়ি পরে এসেছে। মেয়েটির নাম নীলা। আমার পরনে অফ হোয়াইট কালারের পাঞ্জাবি। আমরা হাত ধরাধরি করে হাটছি।

না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার মতো এটা কোনো স্বপ্ন নয়, একদম বাস্তব।

চট্টগ্রাম থেকে

বেচে থাকা

– আবু সুফিয়ান কানন

আমি বরাবরই ভীষণ রকমের আবেগপ্রবণ। এটা আমার মায়ের কথা। এবং এ জন্য আমাকে অনেক ঠকতে হবে জীবনে এটা তার বদ্ধমূল ধারণা। আমার অবশ্য তা মনে হয় না।

আমি তখন ছোট। খুব সম্ভবত ক্লাস ফোরে পড়ি। স্কুলে যাবার পথে রোজ একজন বয়স্ক ভিক্ষুকের সঙ্গে দেখা হতো। সব সময় তার পরনে থাকতো শতচ্ছিন্ন শাড়ি যা দিয়ে ওই ভদ্রমহিলা নিজের শরীরও ভালোভাবে ঢাকতে পারতেন না। আমার মাঝে মধ্যে স্কুলের টিফিনের পয়সা বাচিয়ে তাকে দুই এক টাকা দিতাম আর ভীষণ মায়া হতো। ভাবতাম, আমার যখন অনেক টাকা হবে তখন এই মহিলাকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দেবো। প্রায়ই দেখা হওয়ায় আমাদের দুইজনের মাঝে বন্ধনহীন একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আমাকে রোজ না দেখলে তার ভালো লাগতো না, আমারও না। হয়তো সে কারণেই একদিন অনেকটা অধিকার নিয়েই বললেন, হ্যারে বাছা, বাড়িতে মায়ের পুরনো শাড়ি নেই?

আমি তার মনের কথা বুঝলাম। বাড়ি গিয়ে মাকে সব খুলে বললাম। শুনে মা হাসলেন। বললেন, বুড়ো নানির জন্য খুব দরদ দেখছি! তাকে আমি নানি ডাকতাম।

পরদিন সকালে মায়ের অনুমতিক্রমে নানির জন্য মায়ের একটা পুরনো শাড়ি নিয়ে যাই। শাড়িটা তার হাতে দিতেই সে ছেলেমানুষি কান্না শুরু করে দিলেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন আমার জন্য। কি যে ভালো লাগলো আমার।

এক সপ্তাহ পরের কথা। রোজকার মতো স্কুলে যাবার পথে বুড়িকে দেখলাম তার সেই পুরনো শাড়ি পরে ভিক্ষা চাইছে। আমি ভীষণ অবাক হলাম। অনেক রেগে গিয়ে বললাম, এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাড়ি পরতে আপনার লজ্জা করছে না?

আমার হাসি দেখে তিনিও হাসলেন। বললেন, শখে কি আর ছেড়া শাড়ি পরছিরে ভাই। গত সপ্তাহে তোমার দেয়া শাড়িটা পরে দুই টাকাও ভিক্ষা পাইনি। লোকজন ভালো শাড়ি দেখে মনে করে আমার বোধহয় অতোটা অভাব নেই। গত দুই দিন টাকার অভাবে একবেলা করে খেয়ে থেকেছি। বুড়ো শরীরে এতো ধকল সয় না। তাই আজ আবার পুরনো শাড়ি পরে বেরিয়েছি। এই দেখো, এর মধ্যে আমার সারাদিনের খাবারের টাকা উঠে গেছে। তুমিই বলো, পেটে ভাত না থাকলে নতুন কাপড়ে কি হবে? বুঝলে তো ভাই। এরই নাম বেচে থাকা।

আমার মন ভীষণ রকমের খারাপ হলো। চোখ থেকে নোনা জল গড়িয়ে পড়লো। আমি হেটে চললাম স্কুলের দিকে।

বনানী, ঢাকা থেকে

সর্বহারা

– বিউটি

জন্মটাকে সার্থক করার জন্য সবাই নাম দিলেন বিউটি। ক্লাস নাইনে উঠে নামের সার্থকতা বুঝতে পারলাম। স্কুল পথে যুবকদের মন্তব্য – কি সুন্দর মাল, দোস্ত এতো পরী, মানুষ না! আগা–পাছা সমান। বৌ হিসেবে পেলে সারা জীবন পূজা করবো। বুক নয়, যেন হিমালয়ের চূড়া।

এসব মন্তব্যে জীবনটা অতিষ্ঠ। ভাবলাম সুন্দর হওয়া সত্যিই পাপ। দীর্ঘ দুই কিলোমিটার রাস্তায় মন্তব্যের অন্ত ছিল না। রাস্তায় ছেলেদের সঙ্গে যোগ হলো কতিপয় স্কুল ছাত্র, তাদের মন্তব্য নীরব। কিন্তু প্রতিদিন পিছু নিতো। বাবাকে মা জানালেন ব্যবস্থা নিতে। এরই মধ্যে মাকে দেয়া শাড়ি পরে নিজেকে অন্য রকম লাগলো। বাবার কাছে বায়না ধরলাম একটা শাড়ি কিনে দেয়ার জন্য। প্রাইমারির শিক্ষক বাবা। তার মেয়ের চাহিদা ঠিকই পূরণ করলেন মায়ের বাধা সত্ত্বেও। শাড়িটি ছিল কচুপাতার কালার। শাড়িটা যখন পড়তাম, নিজেকে প্রকৃতির মতো সুন্দর, মনে হতো। শাড়িটি এতোই প্রিয় ছিল যে, স্কুল টাইম ছাড়া বাকি সময় পরে থাকতাম।

পাশের বাড়ির সুমন, মেধাবী, সুদর্শন, ঢাকা কলেজের ছাত্র। প্রেম নিবেদন করতেই সায় দিলাম। জীবনটাকে আরো সুন্দর মনে হলো। ছুটিতে সুমন বাড়ি এলে বিভিন্ন অজুহাতে তাদের বাড়ি যেতাম। ভালোবাসার পবিত্র ছোয়ায় নিজেকে ধন্য করতাম। সুমনের মা অমায়িক। ভীষণ আদর করতেন। দিনগুলো ছিল স্বপ্নের মতো।

স্কুলের এক অনুষ্ঠানে শাড়ি পরে গেলাম। বখাটে ছেলেগুলো শাড়ি পরা অবস্থায় আমাকে দেখে পাগলের মতো আচরণ শুরু করে দিল। *স্বর্গ থেকে না এলে মানুষ এতো সুন্দর হয় না* মন্তব্যটা তাদের মধ্যে নোমানের। প্রভাবশালী চেয়ারম্যানের একমাত্র অর্ধশিক্ষিত ছেলে। আমাকে প্রেম নিবেদন করে ব্যর্থ হয়।

অনুষ্ঠান শেষে ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরছি। সঙ্গে তিনটা মেয়ে। পথিমধ্যে নোমান পথরোধ করলো। তার প্রেমে রাজি কি না ফাইনাল মত চায়। বিনীতভাবে তাকে ভাইয়ের মতো সম্বোধন করলাম। জবাবে আমাকে জোর করে সবার সামনে জড়িয়ে ধরে কিস দিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে গেলাম। কি করবো ভাবলাম।

মা বললেন আর পড়ানোর দরকার নেই। বাবা বললেন না, আমি চেয়ারম্যানকে জানাবো। তাই জানানো হলো। সামাজিকতা রক্ষার জন্য চেয়ারম্যান বাবাকে আশ্বস্ত করলেন। বাবা বোরখা কিনে দিলেন। কিছুদিন নিশ্চিন্তে ছিলাম।

আমাদের বাড়িটি রাস্তার পাশে। একটু দূরে সুমনদের বাড়ি ছাড়া আশপাশে বাড়ি নেই। হঠাৎ পনেরো দিন পরে আমাদের বাড়িতে তারা এলো। রাত একটা। সর্বহারার তখন দৌরাত্ম ছিল। সর্বহারারা বাবাকে ডাকলো। বাবা ভয়ে দরজা খুললেন। মুখোশ পড়া ছয়জন। হাতে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। শব্দে আমি জেগে উঠলাম। তারা বাবা মাকে এক ঘরে বন্দী করলো। মুখে কাপড় গুজে দিল যাতে শব্দ করতে না পারে। বাকিরা আমার ঘরে চলে এলো। ছোট বোনটা পাশে ঘুমাচ্ছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই কপালে অস্ত্র ধরলো। পরনে সেই শাড়িটি। শাড়িটির এক অংশ মুখের মধ্যে চাপা দিল যাতে শব্দ না করতে পারি।

না, তারা আমাকে ছাড়েনি।

পরদিন নিজেকে আবিষ্কার করলাম থানা সদরের হাসপাতালে।

বাবা ভয়ে কেস পর্যন্ত করেননি। তাকে হুমকি দেয়া হয়েছে।

সেই থেকে সমাজে আমি কলঙ্কিতা, নষ্টা।

বাড়িতে আর সেই শাড়িটি পেলাম না। পরে শুনেছি রক্তমাখা সেই শাড়িটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। তাতে কলঙ্কের ছাপ পড়েছে

কিন্তু নিজের জীবনের কলঙ্ক কি দিয়ে ঢাকবো?

সুমনেরা মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রতিনিয়ত প্রতিশোধের নেশায় ছিলাম। বার বার আত্মহত্যা করতে চেয়েও পারিনি। এতো কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে কেউ বিয়ের সাহস করেনি। পরা হলো না আর বধূবেশে রঙিন শাড়ি।

কষ্টে বেছে নিলাম অন্ধকারের পথ।

নোমান শাস্তি পেয়েছে। নিজের বোমায় তার জীবন শেষ।

বাকি পাচটার একটাকে চরম শাস্তি দিয়েছি। পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছি। সমস্যা হয়নি। কারণ সে এসেছিল নতুন খদ্দের বেশে।

অপেক্ষায় আছি বাকিদের।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

রাজশাহী সিল্ক

– খোরশেদ আলম মণ্ডল

শাড়ি একটি সুন্দর শব্দ। প্রত্যেক নারীর স্বপ্ন। শাড়ির প্রতি বিন্দুমাত্র লোভ নেই এমন নারী পাওয়া দুষ্কর। একটি সুন্দর শাড়িতেই একজন নারীকে পরিপূর্ণ বিকশিত মনে হয়। আবহমানকাল থেকেই বাংলার নারীরা শাড়ি পরেই শ্বশুরবাড়িতে যায়।

সবার জীবনে শাড়ি একইভাবে সুখ-শান্তি নিয়ে আসে না। কখনো কখনো একটি শাড়িই হতে পারে সংসারের সকল অনিষ্টের মূল। হ্যা, একটি সিল্ক শাড়িই একজন নারীর জীবন বিপন্ন করতে পারে।

তথাকথিত সুখের সংসারে ছিল আমাদের এক ভাই, এক বোন, বাবা আর মা। বাবা ছিল কৃষক এবং মা আদর্শ গৃহিণী। আপু ছিলেন ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে এবং আমি ছিলাম ক্লাস নাইনে। দেখতে সুন্দর হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই আপুর নামে বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। সকল ব্যাটসম্যানকে বিভিন্নভাবে আউট করার পর আব্বাও একদিন আউট হলেন অর্থাৎ বিয়েতে রাজি হলেন। ছেলে মিডল ইস্টে চাকরি করে। দুই মাসের ছুটিতে বাড়ি আসবে এবং এসেই বিয়ের কাজ সেরে ফেলবে। আপুর বিয়েতে ইচ্ছা ছিল না। আরো পড়াশোনা করে জীবনকে এক ধাপ এগিয়ে নেয়ার ইচ্ছা যদিও ছিল কিন্তু সবার ইচ্ছার কাছে তার চাওয়ার সমাধি ঘটলো।

ছেলের নাকি যৌতুক নেয়ার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ছেলের বাবা যৌতুক ছাড় দিতে নারাজ। ছেলের যোগ্যতা ভালো কারণেই আব্বাও শেষমেশ কিছু দিতে রাজি হলেন। নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা, তিন বিঘা জমি ও রাজশাহীর একটি সিল্ক শাড়ি দিতে রাজি হলেন।

বিয়ের পর ছেলে চলে গেল কর্মস্থলে। আপুও পড়াশোনা বাদ দিয়ে নতুন জীবন শুরু করলেন আস্তে আস্তে। বিয়ের যৌতুক শোধ করতে একটু দেরি হচ্ছিল। ইতিমধ্যেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা খোটা দেয়া

শুরু করলো আপুকে। মানসম্মানের ভয়ে আব্বা কিছু জমি বিক্রি সুদের ওপর টাকা নিয়ে যৌতুকের পুরোটাই প্রায় শোধ করলেন। বাকি শুধু রাজশাহীর সিল্ক শাড়িটা। শাড়িটা তো আপুই পরবে এ জন্য আব্বু ভাবলেন কিছুদিন পরে দিলেই চলবে।

কিছুদিন পর ছেলে দেশে ফিরে এলো। জাল ভিসা নিয়ে যাওয়ার কারণে জেল খেটে অবশেষে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আব্বার মাথায় যেন বাজ পড়লো। সেই সঙ্গে আপুরও। যাক, কি আর করা! সব কিছু মেনে নিয়ে আব্বু আপুকে বোঝালেন, মা, গ্রামের মানুষ আমরা, কৃষিকাজ করেই সে জীবন চালাতে পারবে।

জীবনটা সাধারণভাবে চললেও হয়তো কথা ছিল না। কিন্তু এরই মধ্যে পাষণ্ড দুলাভাই যৌতুকের শেষ সম্বল শাড়িটা আদায়ের জন্য আপুর ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। মাঝে মধ্যে শারীরিক নির্যাতন তো আছেই। রাজশাহীর সিল্ক শাড়ির অনেক দাম, ওই মুহূর্তে আমরা দিতে পুরোপুরিই অপারগ ছিলাম। কিছু সময় প্রার্থনা করেও আবেদন নিষ্ফলে গেল।

এভাবে শাড়ি আদায়ের নির্যাতনে আপুর জীবনটা বিষিয়ে উঠেছিল। জীবন যদিও সব সময় একইভাবে প্রবাহিত হয় না। কখনো কখনো তার জল বইতে না পেরে দুকূল প্লাবিত করে। তেমনি একদিন সিনেমা কিংবা নাটকের মতো নয়, বাস্তবে আপু সিল্ক শাড়ির গঞ্জনা সহ্য না করতে পেরে বিয়ের দেয়া শাড়িটা গলায় ফাস দিয়ে ঝুলে থাকে শ্বশুরবাড়ির পেছনের আম গাছটার সঙ্গে। লোকজন সব জমায়েত হয়ে আর্তনাদ করে, আহা! কি সুন্দর মেয়েটা এভাবে জীবনটা শেষ করলো।

দুঃখ আমার একটাই। আপুর জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করলো কিন্তু সামান্য একটি সিল্ক শাড়ির চাওয়ার মানসিকতাকে কেউই ঘৃণা করলো না। টাকার অভাবে কেস থানা পর্যন্ত পৌছালো না। স্বজন হারার বেদনাকে সহজেই মেনে নিতে হলো।

রংপুর মেডিকাল কলেজ থেকে

নাতির বিয়ে

–শরীফুল ইসলাম মোগল

আমার বয়স তখন ছয় বা সাত বছর। খালাতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে আম্মার সঙ্গে বড় খালাদের বাড়িতে বিয়ের এক সপ্তাহ আগেই আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম আমি ও ছোট বোন তুলি। সে এক আনন্দঘন পরিবেশ। ওই সময় এক বাড়িতে বিয়ে মানে সারা গ্রামে বিয়ে বিয়ে আমেজ। বিয়ের ধুমধাম, আনন্দ–কোলাহলে কাকপক্ষীও বুঝতে পারতো কারো বিয়ে হতে চলেছে। খালুদের বাড়িতেও আনন্দ উৎসবের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। বিয়ে উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাড়ির বাইরের আঙিনায় পাড়া–প্রতিবেশী, আত্মীয়–স্বজন আর গ্রাম্য মাতব্বরদের খোশগল্পের আসর বসতে লাগলো।

পান–সুপারি আর হুক্কা–তামাক যোগান দিতে রীতিমতো ব্যস্ত থাকতে হতো খালাতো ভাই ও বোনদের। অন্যদিকে বাড়ির ভেতরের আঙিনায় তখন প্রতিবেশী সুকণ্ঠি মহিলাদের নিয়ে বিয়ের *গীত*

গাইতে বসতেন মা-খালারা। আমরা পিচ্চি-পাচ্চারা ব্যস্ত থাকতাম রসুন পটকা, চকলেট বোমা এবং শস্তা হাওয়াই বাজির উৎসবে। আনন্দ কোলাহলের আতিশয্যে আমার গোসল খাওয়াও হয়ে গেল অনিয়মিত। যাহোক, অবশেষে বিয়ের কাঙ্ক্ষিত সেই দিন এসে গেল। ভোর ছয়টায় বরপক্ষকে কনের বাড়িতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে পাকা কথা দেয়া হয়েছে আগেই। সারা রাত কারো চোখে ঘুম নেই। রাত দুটার দিকে শুরু হয়ে গেল যাত্রাপূর্ব প্রস্তুতি। সে পাড়ার মণ্ডল বাড়ি থেকে ধার করে আনা হয়েছে বিয়ের পোশাক-পাজামা, পাঞ্জাবি ও টুপি। তখন নাকি এটাই ছিল রীতি যে, এক গ্রামে বিয়ের পোশাক একজনের থাকলেই ব্যস। আর চিন্তা নেই। গ্রামের বা পাশের গ্রামের লোকজনও ওই পোশাক ধার করে নিঃসংকোচে বিয়ে পর্ব চুকিয়ে নিতো। এতে লজ্জার কিছুই ছিল না।

রাত সাড়ে তিনটার দিকে বরপক্ষের মানে আমাদের যাত্রা শুরু হলো কনেপক্ষের বাড়ি অভিমুখে। দূরত্ব দশ মাইল। আমাদের যানবাহন ঘোড়া, গরু ও মহিষের গাড়ি। ঘোড়া গাড়িতে বর, গরু ও মহিষের গাড়িতে বরযাত্রীরা। অতি আদুরে অল্প বয়স্ক এবং নিকট আত্মীয় বলে আমাকে বরের গাড়িতে স্থান দেয়া হয়েছে। কনকনে শীতের রাত। ঘন কুয়াশায় সামনের কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। কোথাও কোনো সাড়া-শব্দ নেই। নিঝুম প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে ভেসে আসছে শুধু গাড়ি চলার একটানা *ক্যাচর ক্যাচর* শব্দ। প্রায় সাড়ে ছয়টার দিকে আমরা কনে বাড়িতে পৌছালাম। কলা গাছের গায়ে দেবদারু পাতা জড়িয়ে আর সুতালিতে রঙিন কাগজ লাগিয়ে সাজানো হয়েছে বিয়ের গেট। বিশেষ অংকের সম্মানী দিয়ে গেটের ফিতা কেটে বরকে তার সহযাত্রীদের নিয়ে ভেতরে নির্ধারিত স্থানে আসন নিতে হবে। গেটের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমরা সবাই সেখানে প্রবেশ করলাম। অতঃপর বরপক্ষের তরফ থেকে আনা পান-সুপারি, মিষ্টি, গহনা এবং বিয়ের শাড়ি কনেপক্ষের নিজস্ব লোকের মাধ্যমে অন্দরমহলে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এর কিছুক্ষণ পরেই চারদিকে কেমন যেন ফিসফিস গুঞ্জন শুরু হলো।

জানা গেল, কনের জন্য বরপক্ষের নিয়ে আসা বিয়ের শাড়ি ভেতরে ভাজে ভাজে ছেড়া। এ কথা শুনে বরপক্ষের তো লজ্জায় মাথা হেট। কনেপক্ষের লোকদের টিপ্পনিতে বরপক্ষের মধ্যে নেমে এলো লজ্জাকর নীরবতা। কনেপক্ষের অন্দরমহলের রমণীদের ধারণা, কৃপণতা করে অল্প পয়সা দিয়ে রিজেক্ট শাড়ি কিনে আনা হয়েছে। এদিকে বরপক্ষের শাড়ি ক্রেতারা ভেবেই পাচ্ছেন না কিভাবে এমন ঘটনা ঘটলো। শাড়ি কেনার সময় নাকি ভাজ খুলে ভালোভাবে দেখে নেয়া হয়েছে। এমনকি শাড়ির ভাজ নষ্ট হতে পারে এমন আশংকায় বরালয়ে পর্যন্ত শাড়ি খুলে দেখা হয়নি। শেষে তারা বুঝতে পারলো, চতুর দোকানি ভালো শাড়ি দেখিয়ে চোখের পলকে রিজেক্ট শাড়ি গছিয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারলেও এ মুহূর্তে কিছুই করার নেই ভেবে কনেপক্ষের কাছে বরপক্ষ নিজেদের অবস্থান ব্যাখ্যা করলো এবং এক পর্যায়ে ক্ষমাও প্রার্থনা করলো। কিন্তু ভুল স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করার পরেও কনেপক্ষের লোকদের, বিশেষ করে মহিলাদের বাকা মন্তব্য অব্যাহত রইলো।

এক সময় পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে লাগলো। কনেপক্ষ এমন আচরণ করতে লাগলো যেন বরপক্ষ নিতান্তই চামার শ্রেণীর। বরের দাদা অর্থাৎ আমাদের জেদি নানাভাই যখন শুনলেন কনেপক্ষের অন্দরমহল থেকে বলা হয়েছে ভাঙা থালা হাতে রাস্তায় দাড়িয়ে শাড়ি কেনার টাকা যোগাড় করতে তখন তার মেজাজ দেখে কে!

তার এক কথা, নাতির বিয়ে এখানে হবে না। পরিস্থিতিগত দুর্বলতাকে যারা সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা হতে পারে না। বরপক্ষের আকস্মিক অনমনীয় সিদ্ধান্তের সংবাদে কনেপক্ষের লোকেরা মোটামুটি শান্ত হলো। অনেক বুঝিয়ে নানাভাইকে শান্ত করা গেলেও তাকে কনেবাড়ির খাবার-দাবার তো দূরের কথা, জল পর্যন্ত স্পর্শ করানো গেল না। বিব্রতকর এক তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে নববধূসহ আমরা বরালয়ে ফিরে এলাম।

পরের দিন সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে পায়ে হেটে নানাভাই তেরো মাইল পথ পাড়ি দিয়ে শহর থেকে একাধিক মূল্যবান শাড়ি কিনে এনে নাতবৌকে দিলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন সাধ এবং সাধ্য উভয়ই তার আছে। বিয়ের দুই দিন পর কনেপক্ষ বর-কনেকে নিতে এলো। এতে বাধ সাধলেন নানাভাই। তার কথা, কনেপক্ষের সঙ্গে আত্মীয়তার কোনো সম্পর্ক বরপক্ষ রাখবে না। কনেপক্ষের নতুন কুটুম্বরা এসে বিয়ে অনুষ্ঠানের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়ে অনেক বুঝিয়েও নানাভাইয়ের সিদ্ধান্ত পাল্টাতে পারলো না। নানাভাইয়ের কথার পিঠে কথা লাগানোর মতো সাহসী লোক শুধু ওই বাড়িতে কেন, প্রতিবেশীদের মধ্যেও ছিল না।

বিয়ের তিন দিন পর আকস্মিকভাবে হার্ট অ্যাটাকে নানাভাই মারা গেলেন। বাড়িতে নেমে এলো শোকের ছায়া। ওদিকে সারা গ্রাম রাষ্ট্র হয়ে গেল, নাতির বিয়েতে কনেপক্ষের অসম্মানজনক আচরণে অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা ও মনঃকষ্টে বেদনাহত হয়ে তিনি হার্টফেল করে মারা গেছেন। এ ঘটনার পর ভাই আর ভাবী কেউ-ই আজ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যও তাদের শ্বশুরালয় পিত্রালয়ে যাননি।

গোপালপুর, কুষ্টিয়া থেকে

ফেরে নাই যে জন

– নূরুল

আমার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়। সম্পর্কে মামা। তার ঢাকায় বিয়ে ঠিক হয়েছে। সেই জন্য বিয়ের এক সপ্তাহ আগে ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছি। সেটা ১৯৯৬ সালের ঘটনা। মামা ব্যবসায়ী ছিলেন। মামা আমাকে নিয়ে ঢাকার ইস্টার্ন প্লাজা থেকে গায়ে হলুদের জন্য এক সঙ্গে পাচটি শাড়ি (প্রত্যেকটি শাড়ির দাম প্রায় তিন হাজার টাকার কাছাকাছি) এবং এর সঙ্গে যা যা লাগে অন্যান্য জিনিস কিনেছিলেন।

১৯৯৬ সালের জুলাই মাসে ঢাকার উত্তরাতে এক কমিউনিটি সেন্টারে মেয়ের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন আবার দেশে নতুন আওয়ামী শাসন এসেছিল যে শাসনের কথা মামা শুনলেই ভয় পেতেন। ১৯৭৫ সালে নাকি মামার কাছ থেকে আওয়ামী বাকশালীরা চাদা নিয়েছে। ১৯৯৬ সালে মামার বিয়ের দিন ঠিকই এর পুনরাবৃত্তি ঘটলো। কমিউনিটি সেন্টারে যাওয়ার সময় গাড়ি আটকিয়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা চাদা দাবি করলো। উপায় না দেখে চাদা দিতে হলো। এরপর আমরা কমিউনিটি সেন্টারে পৌছালাম। মামার সেই পাচটি শাড়ি কেনা বৃফকেসটি মেয়ের এক আত্মীয়ের কাছে দেয়া হলো। কিন্তু মেয়েটি পাচটি শাড়ির একটি শাড়িও পরলো না।

মেয়েটির গায়ে ছিল অন্য মেয়েদের মতো পোশাক। এখন সবার মন শিহরে উঠলো। মামার বিয়ে হয়ে গেল। কমিউনিটি সেন্টার থেকে মামিকে নিয়ে প্রাইভেট কারে গ্রামের বাড়ি নিয়ে এলাম। তখন বাড়িতে দেখি প্রচণ্ড মানুষের ভিড়। সাধারণত নতুন বৌ দেখার সময় অনেক লোক ভিড় করে থাকে। গাড়ি থেকে নামার পর কোনটি মামার বৌ সেটা কেউ চিনতে পারে না, গাড়িতে মামির সঙ্গে আরো তিন চারটি মেয়ে এসেছিল। তখন মানুষকে পরিচয় করে দিয়েছি, এটা মামার বৌ। সেই রাতে আর মামির সঙ্গে কথা বললাম না। পরদিন সকালে মামির সঙ্গে দেখা হলো। মামিকে জিজ্ঞাসা করলাম, মামার এতো দামি ঢাকার শাড়িগুলোর একটি শাড়িও পরলেন না কেন?

মামির চোখে দেখি পানি।

মামি তখন বললেন, ১৯৭১ সালে আমার মায়ের জন্য বাবা শাড়ি ও অন্যান্য জিনিস কিনতে বাসা থেকে বের হয়ে আর ফিরলেন না। পশ্চিমিরা বাবাকে ধরে নিয়ে মেরে ফেললো। বাবার লাশ আর কোনোদিন পাইনি। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, শাড়ি কোনোদিন পরবো না।

কিন্তু পরে মামির সেই প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গাতে পেরেছিলাম। মামি এখন শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরছেন না।

ময়মনসিংহ থেকে

শোক দিবস

দিনটা ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি ২০০২। সেদিনের দুর্বিষহ ঘটনা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। সেদিন আমার জীবনের ভয়াবহ সর্বনাশটি ঘটেছিল।

কলেজ জীবনের প্রথম দিনের কথা। সে এসেছিল পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। কলেজে তাকে প্রথম দেখলাম। জীবনে প্রথম ভালোলাগার জন্ম হলো কোমল, ছোট্ট মনটিতে। ভালোলাগার অবশ্য যথেস্ট কারণও ছিল। সে ছিল যথেষ্ট স্মার্ট, লম্বা, ফর্শা, সুন্দর মুখশ্রী অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই ভালোলাগার মতো চেহারা। সে আমাদের সিনিয়র ব্যাচের ছাত্র ছিল। একই সঙ্গে সে একটি ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিল বেশ ভালোভাবেই যা আমি জানতাম না।

আমিও যথেষ্ট সুন্দরী ছিলাম। অনেকে অবশ্য বলতো, আমি নাকি ছিলাম ক্যাম্পাসের সেরা সুন্দরী, সেই সঙ্গে ছিলাম ভালো ছাত্রী এবং যথেষ্ট বোকা। কেউ কি প্রেমে পড়ে বোকা না হলে?

প্রকৃত নাম প্রকাশ হলে সমস্যা হতে পারে। তাই তার নাম দিলাম তূর্য আর আমার নাম সীমা। একদিন তূর্য তার ভালোলাগার কথা জানালে আমিও আমার কথা বললাম। আমাদের ভালোবাসার যাত্রা শুরু হলো।

এতোদিন কলেজেই আমাদের দেখা হতো। কিন্তু তূর্য এতে সন্তুষ্ট ছিল না। সে চাইতো কলেজ ছাড়াও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হোক। তার পক্ষে কলেজে আমাকে একান্ত করে পাওয়া সম্ভব নয় বলে সে এ ব্যাপারে একরোখা হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমি আমাদের বাড়ি থেকে অন্য সময় সহজে বের হতে পারতাম না বলে সেটা সম্ভব ছিল না। আবার আমি কলেজে ক্লাস মিস দিয়ে কোথাও যেতে চাইতাম না।

এমনি সময়ে এলো একুশে ফেব্রুয়ারির সেই দিন। তূর্যের সঙ্গে কথা হয়েছিল সেদিন আমরা ঘুরবো। তূর্য বলে দিয়েছিল আমি যেন শাড়ি পরে আসি এবং অবশ্যই প্রভাতফেরিতে যোগ দিই। শাড়ি পরেই প্রভাতফেরিতে গেলাম। তূর্য ক্যামেরা এনেছিল। সে প্রভাতফেরি এবং শহীদ মিনারে ফুল দেয়ার অনেক ছবি তুললো। এরপর কলেজে শুরু হলো অমর একুশের বিশেষ অনুষ্ঠান। আমি গান গাইলাম এবং কবিতা আবৃত্তি করলাম। এবার আমরা কোথাও ঘুরতে বের হবো। তূর্য সঙ্গে নিল তার চার বন্ধুকে। এই চার বন্ধুকে আগে কখনো দেখিনি। তূর্যকে আড়ালে ডেকে বন্ধুদের না নেয়ার কথা বললাম।

সে বললো, এটা সম্ভব নয়। কারণ তাদেরকে সে আগেই বলে দিয়েছিল ঘুরতে যাবার কথা। তাছাড়া তাদের সঙ্গে নাকি তার বিশেষ একটা কাজ আছে। তাই ছাড়া যাবে না বন্ধুদেরকে। কি আর করা! অগত্যা রাজি হতে হলো।

কলেজ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এক পার্কে গেলাম। সেখানে তার চার বন্ধু আর আমরা দুইজন মোট ছয়জনে মিলে জমিয়ে আড্ডা দিলাম। চার বন্ধুর একজনের নাম ছিল সুমন যার বাড়ি পার্কের কাছেই। আড্ডা শেষে সুমনদের বাড়ি গেলাম সবাই মিলে। ওই বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। সুমন আমাদেরকে তার ঘরে নিয়ে এলো। সিডি প্লেয়ার চালিয়ে দিল উচু শব্দে। আমি তখনো জানতাম না আমার ভাগ্য আজ কি ঘটতে যাচ্ছে।

এক সময় সুমন অন্য তিন বন্ধুকে পাশের ঘরে রেখে এসে বললো, তূর্য–সীমা, তোমরা এ ঘরে থাকো, আমরা পাশের ঘরেই আছি।

সুমন চলে গেল, তূর্য ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

কিছুটা হতবাক হয়ে বললাম, তুমি এ কি করছো?

তূর্য বললো, আসলে আমি অনেক দিন থেকেই চাচ্ছিলাম তোমাকে একান্তভাবে কাছে পেতে। আজ যখন সুযোগ এলো তখন...।

এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, আমি ঝাঝের সঙ্গেই বললাম।

কিন্তু তূর্য আমার সে কথায় কান দিল না। পেছন দিক থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। সে আলতোভাবে আমার ঠোটে ঠোট রাখলো। সে আমার কপাল, গাল ও গলায় চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। আমার দেহে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। নিজেকে তখন তূর্যের হাতে ছেড়ে দিলাম।

এবার তূর্য আমার শাড়ি এক টানে অর্ধেক খুলে ফেললো। অর্থাৎ কোমরের উপরে কোনো শাড়ি নেই। তূর্য আস্তে আস্তে আমার ব্লাউজের হুক খুলতে লাগলো। পুরো অর্ধনগ্ন আমি। তূর্য আমার বুকের মাংসপিণ্ড দুটো নিয়ে খেলা করতে শুরু করলো। সে দুই হাতে পিষতে লাগলো এগুলো।

এবার সে পেটিকোটের দড়ির ভেতর দিয়ে নাভির নিচে হাত নামাতে লাগলো। আমি বুঝলাম সে চূড়ান্ত ব্যাপারটি করার ইচ্ছায় এমনটি করছে। কিন্তু এতে প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা না করে এগোনো মানে নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনা। তাছাড়া এতোক্ষণ যাই করলাম কিন্তু বিয়ের আগে কোনো মতেই আমি ওই চূড়ান্ত কাজটুকু করতে রাজি নই।

কিন্তু তূর্য এক্ষেত্রেও জোর খাটাতে চাইলো। সে চাইলো আমার পুরো শাড়ি খুলে ফেলতে। বাধা দিলাম। সে আমার কথা শুনতে চাইলো না। ঠিক তখনি আমি আত্মরক্ষার্থে তূর্যের হাতে দিলাম কামড়। তূর্য ব্যথায় চিৎকার করে উঠলো। ঘরের দরজা খুলে ডাক দিল বন্ধুদের। তারা সবাই এসে আমাকে ধরলো এবং পুরো নগ্ন করে ফেললো।

কে যেন বললো, তূর্য শালা, তোর চয়েস আছে। একদম ... মাল।

এরপর যা হওয়ার তাই হলো। তূর্যসহ পাচজন হিংস্র নরপশু আমার শরীরটাকে ভোগ করলো। দীর্ঘ দুই ঘণ্টা তারা তাদের শারীরিক তৃপ্তি মেটালো আমার মাধ্যমে। রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হলাম। এতো দীর্ঘ সময় আমি শুধু ব্যথায় কুকড়াচ্ছিলাম। কিন্তু আমার যে কিছুই করার নেই।

এক সময় আমি জ্ঞান হারালাম। তারা পানির ঝাপটা দিয়ে আবার জ্ঞান ফেরালো। কিছুক্ষণ পর একটি রিকশা ডেকে তাতে উঠিয়ে দিল।

আসলে তূর্যের উদ্দেশ্যই ছিল আমাকে ভোগ করা। সে আমাকে প্রকৃত ভালোবাসেনি। ভালোবাসার অভিনয় করলো মাত্র যা আমি বুঝতে পারিনি। এ জন্যই তো প্রথমে বলেছি আমি বোকা, মস্ত বোকা। একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় শোকের দিন। আর এদিনেই আমি এক সঙ্গে প্রতারণা ও গণধর্ষণের শিকার হলাম। আমার জীবনে ঘটে গেল ভয়াবহতম সর্বনাশ। এদিনটি আমার ব্যক্তিগত জীবনে শোকের দিন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, গাজীপুর থেকে

অঘটন

– মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন

এক বিকেলে বাসায় বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। এমন সময়ে বন্ধু অপু এলো। তার শুকনো মলিন মুখটা দেখেই বুঝতে পারলাম সামথিং ইজ রঙ। জিজ্ঞাসা করতেই বললো, ভাবীকে না বলে ওনার দুটো শাড়ি এনেছিলাম। এগুলো না পেয়ে ভাবী বাসায় এক হুলস্থুল কাণ্ড বাধিয়ে ফেলেছেন।

বললাম, তুই লুকিয়ে শাড়ি এনে কি করেছিস?

অপু বললো, কয়েকদিন যাবৎ রুমার সঙ্গে রাত কাটাচ্ছিলাম।

জানতাম কয়েক মাস আগেই রুমা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে। বললাম, তোদের একত্রে রাত কাটানোর সঙ্গে শাড়ির সম্পর্কটা কি?

সে বললো, রুমার বেডরুমটি ছিল দোতলায়। তাই ভাবীর শাড়ি দুটোকে গিট দিয়ে দিয়ে এক মাথা রুমার কাছে ছুড়ে মারতাম, তারপর ও সেটা রেলিংয়ে বেধে দিতো। এবং আমি ওটা বেয়েই উপরে উঠতাম। এভাবে বেশ ভালোই কাটছিল আমাদের। কিন্তু বিধি বাম! গত রাতে আমরা যখন উত্তেজনার চরম মুহূর্তে ঠিক তখনই তার দাদি এসে উপস্থিত। তাড়াহুড়ো করে কোনো রকমে ফিরে এলাম।

ভোরেই শাড়িগুলো লন্ড্রিতে দিয়েছিলাম। ইচ্ছা ছিল সন্ধ্যায় ভাবীকে এগুলো ফিরিয়ে দেবো। কিন্তু কপাল এতোটাই মন্দ যে, একটু আগেই বাসায় ঘটে গেল আরেক অঘটন। এ পরিস্থিতিতে আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না।

সব শুনে তাকে কি পরামর্শ দেবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবুও একগাদা সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে সেদিন তাকে বিদায় করেছিলাম। পরে জেনেছিলাম ওই ঘটনার পর তাদের সম্পর্কেরও ইতি ঘটেছিল।

কুলসুমবাগ, চরফ্যাশন, ভোলা থেকে

বিষক্রিয়া

– তাজ

এখন রাত প্রায় দ্বিপ্রহর। ঘণ্টার কাটা বারোটা ছুই ছুই, মধ্য রাতের কপোতাক্ষ ডাউন ট্রেনটি হয়তো এখনি ঝমঝম করে দূরে মিলিয়ে যাবে। আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাদ। ছেড়া মেঘের ফাকফোকর গুলিয়ে মরা জ্যোৎস্না এই মধ্য রাতের প্রকৃতিকে বড় অচিন করে আনে। এক পশলা ধূলি ভেজানো বৃষ্টি সন্ধ্যাকে যেমন গভীর করেছিল, এখন হিম শীতল ঝিরঝিরে দখিণা বাতাস তাকে আরো গভীর থেকে গভীরে নামিয়ে আনে। জলসিক্ত হাসনাহেনার গন্ধ মাদকতা ছড়ায়।

আজ ওর চেহলাম। সবায় বলে চেহলাম থেকেই নাকি বিদেহী আত্মার পরলোকে স্থায়ীত্ব লাভ। তবে ও কি আর থাকবে না। দুচোখে ঘুম নেই। পরিবারের অন্য সবাই আমার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন। কিন্তু আমি তো ভালো আছি, ভালো থাকি যতোক্ষণ পর্যন্ত না ওই মধ্য রাতে...।

ও আমার পরিপূরকভাবে ছিল। যায়যায়দিন আমার চেয়ে ওর কাছে বেশি প্রিয় ছিল। ভালোবাসা বিশেষ সংখ্যাটির কিছু লেখা ওর কাছে খুব ভালো লেগেছিল।

এক বিকেলে ব্যস্ততার ফাকে ও আমাকে বললো, তাজ, তুমিও তো ভালোই লেখো, কোনো এক সংখ্যায় লিখলেও তো পারো।

চট করে ওর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলাম।

প্রেম ভালোবাসা, সুখ, দুঃখ, রাগ, ক্ষোভ এসবের বহিঃপ্রকাশ একেক পাত্রে একেক রকম। না হলে কেনই বা চাষা-ভুষা আর দিনমজুরের ঘরকান্নায় চুলোচুলি লাঠালাঠি শেষেও দিব্যি ঘর-সংসার। আবার কেনই বা বুনিয়াদী বংশের ঘরকান্নায় আপনি থেকে তুই-তোকারিতে নামলেই গুরুতর বিপর্যয়। আসলে সবই বাস্তব। না হলে সেদিন কিই বা এমনটি ঘটেছিল, *দোগাছি বস্ত্র বিতান* থেকে শাড়িটা তো সেই পছন্দ করলো। আমি অবশ্য দোগাছিতে যেতে চাইনি। কারণ আমি জানতাম *এক দর* লেখা থাকলেও কখনো কখনো শতকরা সত্তর থেকে আশি ভাগ সময়েই দরাদরি হয়ে থাকে।

যা তার চোখে ধরলো তা সে নিল। আমার অবশ্য শাড়িটি কিনতে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাৎক্ষণিক তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে চাইনি। নিয়তি পক্ষে থাকলে হয়তো প্রসঙ্গটি এখানেই থেমে যেতো। কিন্তু বিধি বড় বাম, তা না হলে সমস্যাটি হয়তো এতো দূর গড়াতো না যদি না পাশের বাড়ির রাজুর মা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। রাজুর মায়ের এবং ওর শাড়ির মধ্যে কোনো তফাত ছিল না।

একই নাম, একই ডিজাইন, সুতিতে তো একই, অথচ দামে যে এতো বিভেদ এটাই বিস্ময়। সামান্য একটা সুতির শাড়ির ক্রয় মূল্য দুই থেকে চারশ টাকার ব্যবধান। ছোট চাকরি, দুর্মূল্যের এই বাজারে চারশ টাকা গচ্চা বিবেকের কাছে মেনে নিতে বড় কষ্টই হচ্ছিল। ওর যে কষ্ট হচ্ছিল না এমনটি নয়। কিন্তু কষ্টের বহিঃপ্রকাশ আমার ব্যর্থতাকে নিয়েই জড়িত। আমি কেন ওই দিনই বা তাকে শাড়ি দিতে গেলাম। আর যখন গেলামই তখন দোগাছি ভিন্ন কি অন্য দোকান ছিল না ইত্যাদি অভিযোগের ছড়া গেথে আমার শুনিয়ে শুনিয়ে আওড়ে যেতে লাগলো। আমিও রক্ত মাংসের মানুষ, নিজের অদৃষ্টের সঙ্গে স্বামী, সন্তান, এমনকি শ্বশুরকুলকে নিয়ে যখন নাড়া দিল তখন আর আমার আবেগকে দমিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে এলো।

এক পর্যায়ে তুমুল হই-চই এর মাঝে ওর চোয়ালে দুটি চড় বসিয়ে দিলাম।

ছিটকে মাটিকে ও লুটিয়ে পড়লো।

উন্মাদের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

সমস্ত রাত দুটি চোখের পাতা এক হয়নি। বন্ধু রমা সারা রাত অনেক বুঝিয়েছে। ভোর থেকেই মাথা ব্যথায় কাতর হয়ে গেলাম। আবছা অন্ধকারেই রাস্তা ধরে হাটছি। হঠাৎ একটা ছেলে আমাকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কেদে ওঠে।

ভাইয়া! তুমি কোথায় ছিলে, শিউলিভাবী লাইনে মাথা দিছে।

অজস্র জোনাকি চোখে সাড়াশি দিয়ে যেন হৃদপিণ্ডটাকে আটকে ধরলো।

শুধু অন্ধকার দেখলাম।

কানের মধ্যে শ্লথ গতিতে হই চই ভেসে এলো।

কে যেন বলছে, মধ্য রাতের কপোতাক্ষ ডাউন ট্রেনটির নিচেই মেয়েটি আত্মহত্যা করলো।

কুষ্টিয়া থেকে

সহজ সরল উদার

– মাহবুব

আমার নিরাবরণ, নির্লোভ মা নতুন শাড়ি দেখে সানন্দে ছুটে এসে নেয়া তো দূরে থাক, দশ হাত দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ে। সহজাত কিশোরীসুলভ অনুযোগ মিশ্রিত আক্ষেপে বকা শুরু করে দেন, কেন আনতে গেলি এতো দামি শাড়ি? কে বলেছে তোকে শাড়ি আনতে? ইত্যাদি।

আমি প্রতিবার মাকে আশ্বস্ত করার প্রয়াসে মিথ্যা বলি, কে বললো মা, এই শাড়ি বেশি দামি? আমি তো মোটে একশ পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনে এনেছি! অথচ শাড়িটা চোদ্দশ টাকা দিয়ে কেনা।

মা তখন স্মিত হাসি নিয়ে তাকান। হয়তো আমার কথাই সত্য বলে ধরে নেন। আকাশের মতো সরল উদারতা মায়ের সেই চোখের দৃষ্টিতে। সত্যি আমার মা আক্ষরিক অর্থেই সহজ সরল।

মায়ের জন্য শখ করে কতো শাড়িই তো কিনলাম। মা কোনোদিনও ওই সব শাড়ির একটাও পরে দেখেননি। সব একে একে জমা হয়ে পড়ে আছে। হতদরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের কেউ কেউ এসে

অনটনের কথা প্রকাশ করলে তাদেরকে ওই সমস্ত সাত হাট খুজে বেছে বেছে কিনে আনা শাড়িগুলো নির্দ্বিধায় মা দান করে দেন। কোনো কিছু দান করার ক্ষেত্রে মায়ের মতো উদার হাত জীবনে অল্প দেখেছি।

নেত্রকোনা থেকে

বিবর্ণ

– স্বপন

আম্মা ঢাকা আসবে জেনে খুশি হয়েছিলাম। মুন্নি আমার বোন। আমেরিকা যাবে। তাকে সি অফ করার জন্যই আম্মা ঢাকা আসছেন। মনে মনে চিন্তিতও ছিলাম আম্মার থাকা খাওয়ার সমস্যা না হয় এই ভেবে। সকালে নাশতা করে, কাপড় চোপড় পরে আম্মাকে আনতে গেলাম লঞ্চ টার্মিনালে।
গিয়ে দেখি লঞ্চ আসেনি। অপেক্ষা করছি লঞ্চের জন্য। যে লঞ্চই আসে, কাছে গিয়ে দেখি আমার কাঙ্ক্ষিত লঞ্চটি কি না! সেটি নয়। কোথাও একটু বসার জায়গা নেই। অন্যদিকে টার্মিনালের তিন ভাগের দুই ভাগ যাত্রীরা দখল করেছে। এ যেন সব সয়ে গিয়েছে। কারো কিছু বলার নেই। তবুও এসবে কষ্ট হচ্ছে না। আম্মা আসছেন তাতেই খুশি। দূরে একটি লঞ্চ আসতে দেখা যাচ্ছে। কাছে না আসা পর্যন্ত বোঝা যাবে না। ধীরে ধীরে লঞ্চটি যখন কাছে এলো তখন বুঝলাম এটিই আমার কাঙ্ক্ষিত লঞ্চ। আম্মা দেখি লঞ্চের রেলিং ধরে দাড়িয়ে আছে। আমি হাত নাড়ালাম, আম্মাও। লঞ্চ ভেড়ার পর একটু অপেক্ষা করে আম্মা এবং সবাইকে নিয়ে বের হয়ে এলাম।
বেবি পাচ্ছি না। যা পাচ্ছি তারও ভাড়া বেশি। কি করবো, বেশি ভাড়া দিয়েই আমি, আম্মা ও বোন একটি বেবিতে উঠলাম। বেবিট্যাকসিচালক শাখারিবাজারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কোন গাড়ি ঢুকছে না। বিভিন্ন জায়গায় লোক ছাড়ানো। আশপাশে, ছাদের উপরে সব জায়গায়। হঠাৎ কিছু ছেলেরা আমাদের গায়ে রঙ ছুড়ে মারলো এবং যুগপৎভাবে ছাদের ওপর থেকেও রঙ ছুড়ে মারা হলো। আম্মার ঘিয়ে রঙের তসর কাতান শাড়িটি বিবর্ণ হয়ে গেল। আম্মার হাসি মুখটি অন্ধকার হয়ে গেল। কি বলবো বুঝতে পারছি না। বললাম, চিন্তা করো না, অবশেষে বাসায় এলাম।
আম্মাকে বললাম, একটু রেস্ট নিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তোমার কাপড়টা চেঞ্জ করে নাও। লন্ড্রিতে দিয়ে আসি। আম্মা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে কাপড়টি দিলেন লন্ড্রিতে ধোয়ার জন্য। লন্ড্রিওয়ালাকে সব খুলে বললাম এবং আম্মার কাপড়টি দেখালাম।
সে বললো, এটি কাতান শাড়ি এবং এ রঙ উঠানো যাবে না।
বাসায় গিয়ে আম্মাকে জানালে আম্মা কিছু বললেন না। কিন্তু এই বিব্রত অবস্থায় পড়ে ঢাকা বেড়ানোর সাধটা মিটে গিয়েছিল সেটা বুঝতে পেরেছি। আমার দুঃখ এখানে, একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়ে রাজধানীতে থাকার সব ব্যয়ভার মিটিয়ে পারিনি আমার আম্মাকে একটি কাতান শাড়ি কিনে দিতে।

গৃন রোড, ঢাকা থেকে

বিশ্বাস

– বিপ্লব

জুলাই ১৯৯৪। আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সদরঘাটে দাড়িয়েছিলাম। হঠাৎ সদ্য ফোটা একটি গোলাপের দিকে দৃষ্টি আটকে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম চৈত্রের দহনে পোড়া পাপড়ির মতো ওর দুই একটা পাপড়ি পুড়ে গেছে। চোখে মুখে বিষণ্নতা ও উদ্বেগের ছাপ ক্রমেই বেড়ে চলছে। কৌতূহলবশত কথা বললাম। নাম জ্যোৎস্না। যথার্থ নাম। জ্যোৎস্নার মতোই দ্যুতি ছড়ায়। তার দূর সম্পর্কের মামার বাসা শ্যামলী। মামা লঞ্চঘাট পৌছে দিয়ে গেছেন। তাদের বাড়ি যেতে ছোট লঞ্চে দুই আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু লঞ্চ আসছে না। মামার বাসা সে একাকী চেনে না? জানতে চাইলাম লঞ্চ না এলে সে কি করবে।

উত্তর না দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তার চোখে–মুখে ফুটে উঠলো এক করুণ ছবি। অসহায় দৃষ্টির মাঝে অস্ফুট কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম। গ্রাম্য সহজ সরলা এক কিশোরী। রাতের সদরঘাট, মৃত্যুপুরীর মতো। ভাগাড়ের লাশের মতো হিংস্র জীব জন্তুর টেনে হেচড়ে ছিড়ে ছিড়ে খাওয়া। একটা বীভৎস দৃশ্য চোখে ভেসে উঠলো। বড়ভাই বলে জোৎস্না সাহায্য চাইলো।

বললাম, রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যদি লঞ্চ না আসে তবে তার মামার বাসায় পৌছে দেবো। মামার বাসার সঠিক ঠিকানা সে বলতে পারলো না। শুধু বাসার বর্ণনা, শ্যামলী। কিন্তু রোড নাম্বার, বাড়ি নাম্বার বলতে পারলো না।

অবশেষে আমার কাছে আশ্রয় চাইলো। আমি সশস্ত্রবাহিনীতে চাকরিরত ছিলাম এবং মেসে থাকতাম। এ অবস্থায় এক সিনিয়র ভাইয়ের বাসায় নিয়ে বিস্তারিত বললাম, কিন্তু ভাবী কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না। ভাই ছিলেন ঢাকার বাইরে তাই ভাবীকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করলাম। তিনি এসব কিছু শুনলেন না। সে বললো আমি গোপনে বিয়ে করেছি। এখন চলে আসায় এসব বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। মেয়েটা এক সালোয়ার কামিজে কেন? অবশ্যই পালিয়ে এসেছে।

এসব কথাবার্তা শুনে জ্যোৎস্না বলে বসলো, আপনার বাসার চলেন।

তখন আর যাই কোথায়। ভাবীর কড়া শাসন। একটা মেয়ে বিশ্বাস করে চলে এসেছে আর তাকে অস্বীকার! অফিসে জানাবো। তখন আমার ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। বাড়াবাড়ি না করে শুধু রাতটা ওকে রাখার অনুরোধ করলাম। কেননা একজন অপরিচিত মেয়েকে এভাবে আশ্রয় দেয়া অফিস কর্তৃপক্ষ সহজভাবে নেবে না। ভাবী হুকুম জারি করলেন, বৌ রেখে চলে যাবে তা হবে না। শাড়ি ও মিষ্টি নিয়ে এসো। বাসর রাত এখানেই হবে। শুনে মেয়েটি লজ্জায় লাল হয়ে গেল। নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু জল জমে উঠলো। আমার দিকে তাকাতে পারছিল না।

আমি বাড়াবাড়ির ভয়ে বাজারে গিয়ে মিষ্টি ও একটা টাঙ্গাইল শাড়ি কিনে আনলাম। শাড়ি নিয়ে ভাবী ওকে দেয়ায় ওর মাঝে আতংকের ছাপ দেখলাম। ওর দৃষ্টি বলছিল সে বাসর রাতের জন্য প্রস্তুত নয়। আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, যতোক্ষণ আমার কাছে আছো সম্পূর্ণ নিরাপদ। তারপরও মনে মনে ভাবলাম, যদি এক বিছানায় থাকি তবে আবেগে কোনো এক সময় নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারি। উন্মোচিত

হতে পারে অজানা রহস্য। সুধাপানে ভরে যেতে পারে দেহ–মন–প্রাণ। কিন্তু হারাতে হবে অমূল্য সম্পদ চরিত্র। সেক্ষেত্রে দূরে থাকাটাই বেশি নিরাপদ।

ভাবীকে বললাম, মেসে বলে আসতে হবে। আর ওকে বললাম, রাতে আসবো না তুমি শান্তভাবে স্বস্তিতে ঘুমাতে পারো।

মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে কোনোমতে ছাড়া পেলাম। পরের দিন গিয়ে ভাবীর ভর্ৎসনা শুনতে হলেও জোৎস্নার চোখে–মুখে যে একটা স্বস্তির রেখা দেখলাম তা কখনো ভুলবো না। ওকে সদরঘাট লঞ্চে তুলে দেয়ার সময় শাড়িটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এটা আপনার স্ত্রীর প্রাপ্য এবং হু হু করে কেদে ফেললো।

বাধ ভাঙা জোয়ারের মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। আমি বললাম, পরিস্থিতি বাধ্য করেছে, শাড়িটা তোমার জন্য কিনেছি। তাই ওটা তোমার।

জ্যোৎস্না ছোট একটা লঞ্চে চেপে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিদায় নিল।

আজো যখন শাড়ি কিনতে যাই, মনে পড়ে জীবনের প্রথম সেই বাসর রাতের জন্য শাড়ি কেনার ঘটনা। মনে পড়ে আমার প্রতি, মানুষের প্রতি জ্যোৎস্নার বিশ্বাসী ও আনন্দশ্রুসিক্ত নয়ন।

নিকুঞ্জ, ঢাকা থেকে

সেই আমি

– সালমা পারভীন খোশনবীশ

শাড়ির প্রতি দুর্বলতা নেই এমন মেয়েমানুষ খুব কমই আছে। শাড়ি মহিলাদের আকর্ষণ করে এটা অনেকেরই জানা। আমার বিয়ের সময় বিয়ের শাড়ি হিসেবে পেয়েছিলাম খুব শস্তায় কেনা একটা *মালা শাড়ি।* সঙ্গে সম্ভবত দুটি সুতির শাড়ি। আর এই যুগে বিয়েতে কতো শাড়ির সমাহার।

মা বাবা ছিল না বলে ভাইয়েরা হয়তো আমলেই আনেনি বোনকে অন্তত একটা শাড়ি দিতে হবে। বিয়ের পরদিন ননদ আর এবং জামাই মিলে একটা শিফন শাড়ি উপহার দিয়েছিল। আজো তা মনে আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ননদটি আজ আর বেচে নেই।

তারপর সন্তানেরা এলো। আমার দুই সন্তান রোজ রাতে দুবার করে আমায় ভিজিয়ে দিতো। যেহেতু এক সঙ্গে দুটি শাড়ির বেশি ঘরে পরার ছিল না তাই প্রতি রাতই কাটতো ভেজা শাড়িতে।

খুব ভোরে উঠে শাড়ি ধুয়ে দিতাম। এই সময়টুকু ইচ্ছা থাকলেও ঘরে বাইরে বের হতাম না। তারপর শাড়ি শুকালে পরে বাইরে আসতাম।

এরপর কতোগুলো বছর কেটে গেল। শাড়ি নিয়ে এমনই কতো না কাণ্ড ঘটে যায়। মাঝে মধ্যে আমার স্বামীও কিনে দিয়েছেন।

আমার স্বামী একবার একই পৃন্টের তিনটা *বৌরানী* শাড়ি এনে দিয়েছিলেন। তাতে আমি অখুশি ছিলাম না। কোথাও খুব একটা যেতাম না। কারণ ভালো শাড়ি দরকার হবে। একবার স্বামীর বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার দরকার হয়ে পড়লো। তখন জায়ের একটা ভালো শাড়ি চেয়ে নিয়ে বেড়াতে গেলাম।

এমনই দুর্ভাগ্য, শাড়িটা কোথায় যেন একটু ছিড়ে গেল। ছেড়া শাড়ি ফেরত দিতে খুবই লজ্জা পেলাম।

ভালো শাড়ি যখন মোটেই ছিল না, একদিন আমার ছোট বোন স্বামীকে বললো, আমার নাকি ভালো শাড়ির শখ।

এই কথা শুনে স্বামী আমাকে বললেন, চলো, ঢাকা থেকে তোমাকে শাড়ি কিনে দেবো। শুনে আমি তো মহাখুশি। তখন ছিল রোজার দিন। সেহেরি খেয়ে আর ঘুমালাম না। ভোরে টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম।

বায়তুল মোকাররম থেকে একটা সাউথ কাতান কিনে দিলেন আঠারোশ টাকার মধ্যে। এর আগে এতো দামি শাড়ি কোনোদিন পরিনি। মনটা খচ খচ করতে লাগলো আবার আনন্দও হলো। শাড়িটার জমিন ছিল গাঢ় নীল, পাড় লাল–খয়েরির জরির কাজ করা।

স্বামী একবার এক সঙ্গে কয়েকটা শাড়ি কিনে দিয়েছিলেন। মনে আছে, অভিমান করে স্বামীকে বলেছিলাম, আমাকে শাড়ি কিনে দাও। তিনি বলেছিলেন আমিই তো তোমার শাড়ি। তখন ওনার দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম, দেখো তো এই শাড়িতে আমাকে কেমন মানিয়েছে।

জবাবে বলেছিলেন, চমৎকার। এমন একটা মজার কাণ্ডতে দুইজনে হেসে গড়িয়ে পড়েছি।

আজ আর ভালো শাড়ি পরার কোনো শখ নেই। কেউ যদি শাড়ি কিনে দিতে চায় তাহলে মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যায়। মন এতোটাই খারাপ হয়ে যায় যে, চেহারায় কঠিন মূর্তির আকৃতি ফুটে ওঠে। নিজকে সামাল দিতে পারি না। ভালো আচরণের বিপরীতটি উপস্থিত হয়।

মনে হয় কি হবে ভালো শাড়ি পরে যখন ভালো শাড়ির শখ ছিল তখন তো পাইনি। তাছাড়া আমার নবীমেয়ে ফাতেমা (রাঃ) মাত্র দুটি বস্ত্র পরিধান করতেন।

তবে আজ আমার কলেজ পড়ুয়া অষ্টাদশী মেয়ের মাঝে আমাকে খুজে পাই। অনেক শাড়ি হয়েছে তার। প্রতিদিন সে সুন্দর করে শাড়ি পরে পরিপাটি হয়ে এসে গম্ভীর মুখে বলে, মা, দেখো তো আমাকে পরী রানীর মতো লাগছে নাকি?

এ যেন ঊনত্রিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া সেই আমি।

ধোলাইপাড়, ঢাকা থেকে

কালো বাঘিনি

- Siabh

বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ শাড়ি। শাড়ি বাঙালি নারীর রূপে মায়াময় লুকোচুরির আবেদন ছড়িয়ে রাখে। দেয় অপার সৌন্দর্য। শাড়ি নিয়ে মিশ্র অভিজ্ঞতা থাকলেও অনূর্ধ সাতশ শব্দের সীমাবদ্ধতায় কেবল মধুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছি। কর্মসূত্রে যতোবারই দেশের বাইরে গিয়েছি, শাড়ি সম্পর্কে তাদের বিশেষ কৌতূহল লক্ষ্য করেছি। সংক্ষিপ্ত রূপে এ রকম :

শাড়ি কতো টুকরো পোশাক, পরলে যেমন দেখায়, এটা কি এভাবে বিক্রি হয়। শাড়ি যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টিকারী। ছয় মিটার পোশাক সামাল দিয়ে কিভাবে অফিসের কাজ সুষ্ঠু রূপে করা সম্ভব। জাপানের

পথে গাড়ি থামিয়ে তাদের শাড়ির দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। শাড়ি আমাদের দাফতরিক পোশাক। তাই বিদেশে যাওয়ার সময় গরদ, জামদানি আর টাঙ্গাইল শাড়ি নিতে কখনো ভুলি না।

স্কুল জীবন শেষ হওয়ার আগেই শাড়ি আর শাড়িতে নারীর আবেদন আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করতো। ভাবতাম শ শ শাড়ি থাকবে আমার। মেধাবী হওয়ায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দের আভাস আমাকে এমন কল্পনা এনে দিতো। এমন ঘরের একমাত্র আমি ছাত্রজীবন শেষ না হতেই কর্মজীবন শুরু করেছি। তাই সব দিক থেকেই এমন কল্পনা অলীক নয়।

এদিকে আমার স্বামী পোশাক বিষয়ে দারুণ শৌখিন। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা হওয়ায় এসব বিষয়ে যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে পারেন না। তবুও আমার জন্য নিজেই শাড়ি কিনে থাকেন। প্রথম থেকেই আমাকে তার আঞ্চলিক ভাষায় কালো বাঘিনি বলে ডাকতেন। অবশ্যই একা একা এবং শাড়ি কেনার সময়। পাচ সাত বছর পর জেনেছি ওই শব্দের অর্থ কালো বাঘিনি। তাদের পরিবারে কাউকে প্রশ্ন করলে হাসতো এবং বলতো যে, আমাকে এ নামে ডাকা সঠিক নয়। যখন তার সঙ্গে পুরোপুরি অ্যাডজাস্ট করতে পেরেছি তখন তিনিই এর মানে বলে দিয়েছেন। কালো গায়ের রঙে যা মানাবে সেটাই তিনি কিনে দিতেন, সঙ্গে আমার পছন্দেরটাও। তাই এ নিয়ে মনে কোনো ক্ষোভ জন্ম নেয়নি। কর্মজীবন, পড়ালেখা, সন্তান, সংসার এসবের চাপে শ শ শাড়ির কথা মনে আসেনি। তবে তিনি শাড়ি কিনে না দিলে অর্থাৎ আমাকে দায়িত্ব দিলে আমার কষ্ট লাগে। সময় পান অল্প। তাছাড়া দুজন দুই জেলাতে কর্মরত। এ জন্য একবারে আট দশটা শাড়ি কিনে দেন। বাবাকেও দেখেছি মাকে এমনটা দিতে। এবং বছরে পাচ ছয়টা অকেশন থাকেই। এক সঙ্গে এতো শাড়ি কেনেন বলে একই পৃন্টের বা বিভিন্ন রঙের শাড়ি আছে আমার। লেখাপড়ার শখ আছে বলে বাচ্চা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করেছেন। এ কারণে আজকাল শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ কিনে দেন। সান্ত্বনা দেন আবার অফিস শুরু হলে শাড়ি কেনা হবে।

আমর রঙ কালো বাঘের রঙের মতো নয় আর তেমন গর্জনও করি না। তবুও আমার এই নাম। কারণ আমি ফর্শা নই। তিনিই গর্জন করেন। তাছাড়া কর্মসুবাদে দুইজনের মধ্যে শ শ কিলোমিটারের দূরত্ব। তাই মিলিত হলে শুধুই প্রেম চলে। তবে কখনো বিপর্যয় আসতে চায়নি তা নয়। দুজনে কতোটা চাই দুজনকে এই পয়েন্টে বিপর্যয় হার মেনেছে। কালো বাঘিনির জন্য তার পছন্দের রঙগুলোর মধ্যে যা বর্ণনা করা যায় তা হলো আকাশ নীল, হালকা গোলাপি, ব্রাউন, শাদা ও সবুজ। এসব রঙের একাধিক শাড়ি ফেলে দিতে বলেন। তাছাড়া শ শ শাড়ির পরিচর্যা করার সময় আমার নেই।

পেপারে একটা শাদা বাঘের ছবি তাকে দেখিয়েছি। খুবই হেসে তিনি বলেছেন, কোনো শাদা বাঘ তাকে বশ করতে পারেনি যা কালো বাঘ পেরেছে।

অথচ তার মতো বিরল গুণের মানুষকে বশ করার কোনো মন্ত্র আমার জানা নেই। বরং তিনিই আমায় বশ করেছেন। প্রচণ্ড সীমাবদ্ধতা ও ব্যস্ততা চাপিয়ে দিয়েছেন যার সঙ্গে রয়েছে অগাধ স্বাধীনতা যা রক্ষা করতে হয়। তিনি আমার শাড়ির চাহিদা পূরণ করে অশেষ করেছেন। তার দৃষ্টিতে আমি যতো দামি মানুষ ততোই দামি দামি দুর্লভ শাড়ি তিনি আমায় উপহার দিয়েছেন। শুধু আমার জন্য

নয়, মা–বোনদের জন্যও তিনি এমন করেছেন। তার চোখে নারী জাতি সম্মানের ও হেফাজতের জন্য। যে মানুষ এর ব্যত্যয় ঘটাবে তার উন্নতি হবে না। কালো বাঘিনি বলে ডাকলেও তিনি আমার সম্মান বোঝেন যা অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়। কেউ কেউ আমাকে বলে, শাড়ির যাকাত দিতে হবে। তবে এতো পাওয়ার জন্য আমাকে নিয়মিত তা থেকে দান করে দিতে হয়। যতোগুলো শাড়ি এক সঙ্গে পাই তার সবগুলো তখনই পরে দেখাতে হয়।

তার কাছে পেতে ভালো লাগলেও আমারও পূর্ণ স্বাধীনতা আছে যখন–তখন ইচ্ছা মতো শাড়ি কেনার। আমারও সময় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে বিদেশে গেলে তার কথা মতো কিছু শাড়ি আনতে হয়। ফোনে এ কথা তার জানা চায়। না কিনলে বা অল্প কিনলে তার যথার্থতা বয়ান করতে হয়। শাড়ি বিষয়ে আমার কোনো স্বপ্ন অপূর্ণ নেই। তাই কোনো প্রয়োজন অনুভব করি না।

মজার বিষয় হচ্ছে, আমরা দুজন দেখতে একই রঙের। এমনকি স্কিন, হাত–পায়ে যথেষ্ট মিল আছে। আমিও তাকে সব কিছু কিনে দিই। কিন্তু কালো বাঘ বলি না। আমার জন্য শাড়ি কেনার সময় কালো বাঘিনি কথাটি শুনতে হলেও এখন তার মুখে উচ্চারিত প্রিয় কথাগুলোর মধ্যে এটাই আমার কাছে অন্যতম প্রিয় শব্দ।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

পুরুষ

– সুমন মুস্তাফিজ

গভীর রাতে সোহাগের ঘুম ভেঙে গেল টেলিফোনের শব্দে। বিরক্ত এবং বিস্মিত হলো সে। কে ফোন করতে পারে এতো রাতে? রিসিভার ওঠাতেই জেনি–র কণ্ঠ ভেসে এলো।

সোহাগ, সরি টু ডিস্টার্ব। উড ইউ মাইন্ড কামিং টু মাই রুম, প্লিজ। ইটস ইমারজেন্সি!

মাঝ রাতে কি এমন ইমারজেন্সি হলো বুঝতে পারলো না সোহাগ। এতো অন্তরঙ্গতা তো এখনো হয়নি তাদের।

তিন সপ্তাহের একটা কোর্সে সিঙ্গাপুর এসেছে সোহাগ। হোটেল *বুলেভার্ড*–এর চারশ বারো নাম্বার রুমে ঠাই হয়েছে তার। জাস্ট উপর তলায় পাচশ বারো নাম্বার রুম জেনির। কোর্সের প্রথম দিনে বাঙালি কৃষ্টি সম্বন্ধে বলার সময় শাড়ি প্রসঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিল জেনি। এরপর সোহাগের রুমে এসে শাড়ি সম্পর্কে আরো জেনেছে সে। ইওরোপিয়ান জেনির অকৃত্রিম শাড়িপ্রীতি দেখে মাত্র গতকাল একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করেছে সোহাগ তাকে।

দ্রুত একটু ফ্রেশ হয়ে জেনির দরজায় টোকা দিল সোহাগ। নকের অপেক্ষায়ই ছিল যেন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিল জেনি। পরনে গতকালের উপহার পাওয়া শাড়ি।

ওফ! সারা সন্ধ্যা প্র্যাকটিস করে এতোক্ষণে শাড়িটা পরতে পারলাম। কিভাবে যে তোমাদের মেয়েরা এতো বড় কাপড় সামলায়! দেখো তো মানিয়েছে কেমন আমায়? জিজ্ঞাসু দৃষ্টি জেনির।

ভালো করে তার দিকে তাকালো সোহাগ। নিম্নাঙ্গে দুই তিন পাক দিয়ে শাড়িটা ঊর্ধাঙ্গে পেচিয়েছে কোনো রকমে। ব্লাউজ নেই, ব্রা-র উপরেই চেষ্টা করেছে শাড়ি পরার। আরো দেখাতে ক্যাটওয়াকের ভঙ্গি করলো জেনি এবং এই... যাহ্, শাড়িটা খসে পড়লো!

পুরনো বাঙালি সংস্কার, সোহাগ ঝট করে চোখ সরিয়ে নিল জেনির শরীর থেকে।

ও কাম অন! ডোন্ট বি সিলি। লেটস ট্রাই এগেইন।

জেনির কণ্ঠে তার দিকে ফিরলো সোহাগ। প্যান্টি আর ব্রা পরে সামনে মূর্তিময়ী ভেনাস! নিজেকে সামলে নিয়ে যতোটুকু বিদ্যা আছে তা দিয়েই শাড়ি পরানোর চেষ্টা করতে লাগলো সোহাগ এবং অবধারিতভাবে জেনির শরীরের চড়াই উৎরাই-এ হাত লাগলো তার। আস্তে আস্তে ঘন হতে লাগলো উভয়ের নিঃশ্বাস।

ওকে, দ্যাটস অল।

শাড়ি পরানো শেষ হলে সোহাগ বললো, ইজ দ্যাট এনাফ? জানতে চাইলো সে।

নট এনাফ। ঝাঝের সঙ্গে বললো জেনি। হাউ ডেয়ার ইউ হ্যাভ টাচড মাই প্রাইভেট পার্টস! অ্যান্ড নাউ টেলিং মি ইজ দ্যাট এনাফ? নেভার মাইন্ড, আমিও তোমাকে পোশাক পরিয়ে দেবোক্ষণ। নাউ লাভ মি, কিস মি. প্লিজ। জড়িয়ে ধরলো জেনি সোহাগকে।

এতোক্ষণ অনেক কষ্টে বাঙালি ছিল সোহাগ। এবারে সে পুরুষ হলো।

রমনা, ঢাকা থেকে

বাজি

– খোকন

কে আছিস? মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ছবি দেখে আসতে পারবি?

১৯৮৭ সাল। ক্লাস টেনের ছাত্র। আমরা বন্ধুরা খুব সিনেমা দেখতাম। বেশি দেখা হতো বিকেলের শো। তাই বাবা-মা টের পেতেন না। একটা ছবি সে সময় পাচবার দেখার রেকর্ডও ছিল। একদিন ছবি দেখছিলাম পাচ বন্ধু মিলে। ছবি দেখছিলাম আর তখনই আমার বন্ধু বেলাল বললো, তোদের মধ্যে কে আছিস যে, মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ছবি দেখে আসতে পারবি?

বলা প্রয়োজন, আমাদের শহরে আবার সিনেমা হলে মেয়ে এবং ছেলেদের ছবি দেখার আলাদা আলাদা রুম। বেলালের প্রস্তাবে আমি মিজান, শাহিন, কাঞ্চন সবাই বলে উঠলাম, আমি যাবো, আমি যাবো।

তারপর বললাম, যদি মেয়েদের মধ্যে গিয়ে ছবি দেখে আসতে পারি তবে কি বাজি বল?

বেলাল বললো, যে মেয়েদের মধ্যে গিয়ে সম্পূর্ণ ছবি দেখে আসতে পারবে তাকে পাচশ টাকা দেয়া হবে। তাছাড়া তোদের সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াবো। আর যদি না পারিস সম্পূর্ণ ছবি দেখতে তবে আমাকে পাচশ টাকা দিবি এবং আমাদের বন্ধু সবাইকে বিরিয়ানি খাওয়াবি।

আমার বন্ধুরা কেউ রাজি হলো না। আমি রাজি হয়ে বললাম, আমার পাচশ টাকার সঙ্গে আরো কিছু চাওয়া-পাওয়ার আছে।

বেলাল বললো, কি তোর চাওয়া–পাওয়া?

আমাকে একটা শাড়ি, একটা ব্লাউজ ও পেটিকোট দিবি। আমার বন্ধুরা এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো সিনেমা হলে। তখন আমাদের আশপাশে বসা লোকজন বললো, একি ভাই! আমাদের ছবি দেখতে দেবেন, নাকি আপনাদের কথাই শুনবো? আমরা সবাই চুপ হয়ে যাই।

বেলাল বললো, বাইরে গিয়ে এ বিষয়ে আলাপ হবে।

ছবি শেষে সবাই এক সঙ্গে মাঠে গিয়ে বসলাম। বেলাল বললো, কবে তুই ছবি দেখতে যাবি?

বললাম, নতুন ছবি এলে। কারণ নতুন ছবিতে ভিড় থাকে বেশি। বেশি ভিড়ে ছবি দেখতে গেলে গেটকিপার খেয়াল রাখতে পারবে না।

সব বন্ধুরা এ কথা শুনে সোল্লাসে চেচিয়ে উঠলো। বললো, সাবাস খোকন, সাবাস।

পরের দিন টেইলার্সে গিয়ে ব্লাউজ ও পেটিকোটের মাপ দিচ্ছিলাম। মাস্টার বললো, একি ভাই! সারা জীবন শুধু মেয়েদের ব্লাউজ ও পেটিকোট বানিয়েছি, এবার বানাচ্ছি পুরুষেরটা। তিনি কি যাত্রায় হিজড়ার অভিনয় করবেন?

বন্ধুরা বললো, আরে না, না, অন্য কাজে দরকার হবে।

এদিকে মেয়েদের মধ্যে ছবি দেখার জন্য আমার খালাতো বোন মিমিকে অনেক কষ্টে রাজি করালাম। বললাম, তুই তোর বান্ধবীদের নিয়ে আমার সঙ্গে ছবি দেখবি।

সমস্ত ঘটনা বলার পর ও রাজি হলো। নতুন ছবি এলো। প্রথম দিন ছবি দেখার জন্য ওদের জানালাম।

বেলাল আগের দিন আমাকে ওর বোনের একটা শাড়ি এনে দিল। সঙ্গে নতুন তৈরি ব্লাউজ ও পেটিকোট। ছবি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়। আমার খালার বাসায় পাচটায় যাই। মিমি আমাকে মেকআপ করায়। দাড়ি গোফ ভালোভাবে ওঠেনি তবুও এই প্রথম ক্লিন শেভ করলাম। তারপর পেটিকোট পরে মিমিকে বললাম, তুই অন্য রুমে যা।

ও চলে গেল। আমি ব্যাগ থেকে ব্রা বের করে পরলাম। ব্রা ছিল হার্ড পেস্টিং করা। এটা মার্কেট থেকে আগেই কিনেছিলাম। তারপর ব্লাউজ পরে মিমিকে ডাকলাম। ও এসে হাসতে হাসতে অজ্ঞান হবার যোগাড়। তারপর আমাকে শাড়ি পরিয়ে দিল। আয়নার সামনে গিয়ে নিজেকে নিজেই আবিষ্কার করতে পারছিলাম না।

ভাগ্য ভালো যে, আমার খালা তখন বাসায় ছিলেন না। শাড়ি পরে বসে আছি, দেখি মিমির দুই বান্ধবী পুতুল ও মুক্তা শাড়ি পরে এসেছে। তার কিছুক্ষণ পর আমরা রিকশায় উঠলাম। আমি সারাক্ষণ ঘোমটা দিয়েই রেখেছি। কিন্তু আমার মনে থাকে না যে, আমি মেয়ে সেজেছি। মাঝে মধ্যেই কথা বলে ফেলি। আর রিকশাচালক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। আমার মুখে হাত চেপে ধরে মিমি বলে, ভাইয়া, চুপ কর।

রিকশাচালক হাসি দিয়ে আমার দিকে তাকায়। আর বলে, ভাই, আপনি কি ব্যাডা, না হিজড়া?

মিমি বলে, তুমি রিকশা চালাও, তোমার জানার দরকার কি?

রিকশাচালক বললো, না আপা, এমনি কইছিলাম।

হলের সামনে গিয়ে দেখি বেলালসহ বন্ধুরা। আমাকে দেখেই সে কি হাসাহাসি।

বললাম, চুপ কর।

মিমি চারটা টিকেট কাটলো। আমরা হলে ঢুকলাম। দেখি কয়েকজন মহিলা আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছে। আমি বসলাম মিমি ও মিমির বান্ধবী মুক্তার মাঝখানে যাতে আমার কথা কেউ শুনতে না পারে। ছবি শুরু হলো।

আমরা ছবি দেখছি। মাঝে মধ্যে কথা উচু স্বরে বলা শুরু করে দিই আর তখনই মিমি আমার মুখ চেপে ধরে।

ছবির প্রায় শেষের দিকে, গেটকিপার দেখি সব মহিলা ও মেয়েদের মুখে টর্চলাইট মারছে। আমরা যে সারিতে বসেছি সে সারির আগের লাইনের একটা মেয়ে গেটকিপারকে বললো, কি ব্যাপার, মুখে লাইট মারছেন কেন?

গেটকিপার জবাব দিল, একটা ছেলে নাকি মেয়ে সেজে শাড়ি পরে ছবি দেখতে এসেছে মেয়েদের মধ্যে। তাকে খুজছি।

এই কথা শুনে মিমি বললো, ভাইয়া, তুই জলদি চলে যা। অমনি আমি ওঠে দ্রুত চলে আসছিলাম।

গেটকিপার বলে উঠলো, এই দাড়াও। এই তুমি দাড়াও।

শুনেও না শোনার ভান করে চলে এলাম। মিমি ওই সময় গেটকিপারকে ডেকে বলেছে, ওনাকে ডাকছেন কেন? তিনি আমার খালাম্মা!

আপনার খালাম্মা। গেটকিপার বললো?

মিমির হ্যা সূচক জবাব। আমার খালাম্মা বাথরুমে যাচ্ছে।

আমি গেট দিয়ে বেরিয়ে রিকশায় উঠে দ্রুত চলে যাই খালার বাসায়। ঘোমটা দেয়া দেখে খালা বলেন, কাকে চান?

ঘোমটা খোলার পর খালা বলেন, তোর এ অবস্থা কেন?

সব শুনে হাসতে হাসতে খালার অবস্থা কাহিল।

পরে এক বন্ধুর মুখে শুনলাম, আমি বাজিতে জিতে যাচ্ছিলাম এ জন্য গেটকিপারকে বেলাল বলে দিয়েছে আমার কথা।

পরে বেলাল অবশ্য পুরো টাকা এবং আপ্যায়ন করিয়েছিল সবাইকে। মিমিকে পাচশ টাকা দিয়ে বললাম, শুধু তোর এবং শাড়ির জন্য বাজিতে জিতলাম। তাই তুই এই টাকা নে। তুই এবং তোর বান্ধবীরা খরচ করিস।

মিমি হাসি দিয়ে বললো, সত্যি ভাইয়া, শাড়ি পরলে তোকে একটা শাড়ি কিনে দেবো।

এ কথা শুনে বাসার সবাই একযোগে হেসে উঠলাম।

মোহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে

ডিয়ার নভেল

পোশাক হিসেবে শাড়ি আমার খুবই পছন্দ। কিন্তু অতি দুঃখের ব্যাপার, অনুষ্ঠান ছাড়া শাড়ি পরা হয় না। কারণ এখনো নাকি শাড়ি পরার বয়স হয়নি। শাড়ি নিয়ে খুব বড়সড়ো কোনো ঘটনা না ঘটলেও শাড়ি নিয়ে আমার একটা স্বপ্ন আছে। আমি সবচেয়ে বেশি যাকে ভালোবাসি শুধু তাকেই এ কথাটা বলছি।

ডিয়ার নভেল,
তোমার সঙ্গে শাড়ি পরে দেখা করার সৌভাগ্য এখনো আমার হয়নি। কিন্তু আমার একটা ইচ্ছার কথা শোনো। আমাদের যেদিন বিয়ে হবে (ইনশাআল্লাহ হবে) সেদিন থেকে আমি শুধু শাড়িই পরবো এবং তুমি আমাকে অনেক শাড়ি কিনে দেবে। আমার আলমারি ভর্তি শুধুই শাড়ি থাকবে। কি মনে থাকবে তো?

নাম ঠিকানা বিহীন

বিধবার বেশ

– শিলা

আজকাল আমার খুব কষ্ট হয়। চৈত্রের দাবদাহে পৃথিবী যেমন খা খা করে, আমার বুকের ভেতর তেমন হয়। অতলান্ত অন্ধকার আমাকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে। এখন আমি একাকী থাকতেই ভালোবাসি। অবশ্য ভেবে দেখতে গেলে পৃথিবীর সব মানুষই ভীষণভাবে একা। আমার এই একাকীত্বের অনুভবটাকে আমার শ্বশুরকুলের লোকেরা সঙ্কীর্ণ মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করে। কিন্তু এখন আমার এতে কিছু যায় আসে না। কারণ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে পছন্দ করি না।

সাধারণত আমি পত্রিকা পড়ি না। কারণ এখানে এতো সমস্যার কথা লেখা থাকে যার বিন্দুমাত্র সমাধান করতে পারবো না, খামাখা মন খারাপ করার প্রয়োজন বোধ করি না। কিন্তু আমার ছোট বোনটার আগ্রহের জন্য যায়যায়দিনের বিশেষ সংখ্যা দুই একটি পড়েছি। এখানে শাড়ি সম্পর্কিত লেখার আহবান দেখে লোভ দমন করতে পারলাম না। জানি না যাযাদি এ লেখা ছাপবে কি না?

কথায় আছে, *আপন রুচি খাওয়া আর পর রুচি পরা* এ নীতির সঙ্গে আমিও একমত। অন্য দশটা মেয়ের মতো শাড়ির প্রতি লোভ আমার নেই। আমার শ্বশুরবাড়ি যৌথ পরিবার। দুইটা ননদ আছে, তারাও বাড়ির কাছে। আমার স্বামী আমাকে নিজ হাতে শাড়ি কিনে দেন না। কারণ তাতে কথা বাড়ে। আমার শ্বশুর–শাশুড়ি যেটা পছন্দ করে কিনে দেন সেটাই নিই।

আমার বাপের বাড়ির অবস্থা তেমন ভালো নয়। কিন্তু যখনই সেখানে যাই, আমার বাবা আমাকে কম দামি হলেও রুচিসম্মত শাড়ি কিনে দেন। ফলে শ্বশুরবাড়ি এলেই এরা বলে স্বামীর টাকা দিয়ে শাড়ি

কিনে বাপের নাম করি। এ কথার তেমন প্রতিবাদ করি না। কারণ এতে অশান্তি আরো বাড়বে। এবং নিজের কাছে আমি তো অপরাধী নই।

এতো কিছুর পরেও শাড়িই আমার জীবনকে অন্য খাতে প্রবাহিত করেছে। আমার এক মামা বেশ ভালো চাকরি করেন। অনেক দিন তাকে দেখিনি। বাড়িতে মা বললেন, তুই আর আমি ওখানে যাই। গেলাম। মামা খুব খুশি হলেন এবং একটা দামি শাড়ি দিলেন আমাকে।

শাড়িটা পরেই শ্বশুরবাড়ি গেলাম। সবার চোখ তখন আমার দিকেই গেল। আবহাওয়াটা যে কোন খাতে বইছিল বুঝতে পারছিলাম না। শেষে আমার শ্বশুরই বললেন, খোকার টাকা এইভাবে নষ্ট করলে সেই সংসারের কি উন্নতি হয়?

অবাক হয়ে বললাম, কোন টাকা? কিসের টাকা?

আমার শ্বাশুড়ি বললেন, তুমি যাবার পর থেকেই খোকা ২০০০ টাকা পাচ্ছে না। এখন দেখি সেটা তুমিই সরিয়েছো শাড়ি কেনার জন্য। আর কিনেছো যখন তখন সত্যি কথাটা বললে কি হয়? *বলি ভাতারকে বাপ বানাতে লজ্জা করে না।*

আমার তখন মনে হচ্ছিল সীতার মতো পাতালে চলে যাই। কিন্তু না, আমার পতিদেবতা আসার পর আরো দৃশ্য বাকি ছিল যে।

সেও আমাকে মারলো এবং বাড়ি ছেড়ে যেতে বললো।

আমি এ পৃথিবীই ছাড়তে চাইলাম। অনেক রাতে উঠে সেই শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে কেরোসিনও ঢেলেছিলাম, ম্যাচের কাটি ধরানোর আগেই আমার স্বামী দেখে ফেলে এবং চিৎকার দেয়। ফলে ওই যাত্রায় বেচে গেলাম।

আমার অনুমান, ছোট ননদটা টাকাগুলো নিয়েছিল। তবে এটা তো প্রমাণ করা যাবে না। তাই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি অনেকখানি। এখন শাদা সরু পাড়ের ধুতি পরি। এটা দামিও নয় আবার মানুষের নজরেও কম পড়ে। এ বাড়িতে হঠাৎ অচেনা কেউ এলে আমাকে দেখে চমকে ওঠে এবং বলে, বিধবার বেশ কেন?

আমি স্বর্গীয় হাসি দিই এবং আমার শ্বশুরবাড়ির সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিছু জবাব দেয় না। ইচ্ছা আছে, যতোদিন এ খাচাতে থাকবো, ধুতি ছাড়া অন্য কিছু পরবো না। যদি কোনোদিন মুক্তি আসে তবেই অন্য শাড়ি অঙ্গে দেবো, না হলে নয়।

দৌলতগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা থেকে

স্পর্শ

– লুবনা

ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর শুধু আমাদের দুইজনের একান্ত ভুবনে প্রথম খুশির উৎসব ছিল পহেলা বৈশাখের উৎসব।

দুইজনের আবেগের বেলুন ফুলে–ফেপে তখন আকাশে উড়ে চলেছে অজানা কোনো এক গন্তব্যের দিকে। প্রচণ্ড ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে প্রবল আবেগ নিয়ে সে আমায় তার প্রথম মনোবাসনা ব্যক্ত করলো। জানালো তার ভালোবাসার মানুষটিকে সে সাজাতে চায় পবিত্রতার শুভ্রবসনে। বাঙালি ললনার বহুদিনের ঐতিহ্যবাহী পোশাকে সাজিয়ে সে দেখতে চায় প্রিয়তমার রূপটিকে। গোধূলির কনে দেখা রৌদ্রে সে পেতে চায় প্রিয়তমার পরমতম সান্নিধ্য।

কিন্তু হায়! প্রিয়তমের সে সামান্য ইচ্ছা পূরণের সাধ থাকলেও সাধ্য আমার ছিল না। বহুদিনের জমানো একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র শাড়িগুলোর সম্ভার থেকে তন্ন তন্ন করে খুজেও পেলাম না কাঙ্ক্ষিত সেই শাড়ি। সযত্নে সঞ্চিত স্বল্প টাকাগুলো দিয়ে প্রিয়তম পুরুষটির জন্য কেনা সম্ভব খুবই সাধারণ একটা পাঞ্জাবি। শাড়ি কেনার চিন্তা করা একেবারেই অসম্ভব। তার ইচ্ছার অমর্যাদা হবে মনে করে কষ্টে মনটা কুচকে গেল।

বহু কষ্টে মনের দুঃখ চেপে রেখে তাকে জানালাম শাড়ি পরা সম্ভব নয়। বার বার তার অনুরোধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানাতে বাধ্য হলাম সমস্যার কথা। আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সে পুরুষটি একবারও মুখ ফুটে বললো না পর্যন্ত যে, চলো তোমায় একটা শাড়ি কিনে দিই।

বরং আমার দুঃখে ব্যথিত হয়ে চরম বেরসিকের মতো সে আমায় বললো, থাক, গরমের দিনে শাড়ি পরলে অনভ্যস্ততার জন্য তোমার কষ্ট হতো। দরকার নেই শাড়ি পরার।

৩১ চৈত্র। সে হঠাৎ করেই আমায় মার্কেটে নিয়ে গেল। মনে ক্ষীণ আশার প্রদীপ টিম টিম করে জ্বলতে লাগলো। অথচ সে শাড়ির দোকানের ধারেকাছেও গেল না। নিয়ে গেল বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যা দিয়ে সে সাজাতে চায় তার ভবিষ্যতের সংসার।

বিদায়ী চৈত্রের দুপুরে প্রচণ্ড তাপদাহ উপেক্ষা করে ছোট বোনটিকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিটা দোকান তন্ন তন্ন করে খুজে কিনলাম প্রিয়তমের জন্য একটি বর্ষবরণ পাঞ্জাবি।

রাতে তাকে অবাক করে দিয়ে হাতে ধরিয়ে দিলাম প্যাকেটটি এবং বললাম বাসায় গিয়ে খোলার জন্য।

ঠিক রাত বারোটায় ফোনে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললো, পাঞ্জাবি তার ভীষণ পছন্দ হয়েছে, সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করলো আমাকে কিছু দিতে না পারার জন্য। হঠাৎ করেই মনটা প্রচণ্ড ভালোলাগায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। বছরের প্রথম সূর্যটি দেখলাম প্রচণ্ড মুগ্ধতায়। মুগ্ধতার রেশ নিয়ে আলমারি খুলে পরে ফেললাম লাল সুতায় কাজ করা শাদা জামা।

হাসপাতালে দেখা হলো তার সঙ্গে। শাদা পাঞ্জাবিতে তাকে এতো সুন্দর লাগছিল যা কল্পনারও অতীত। আমার মলিনতা তার পাশে আমাকে সংকুচিত করে দিচ্ছিল। দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে চাইলাম। আসার আগে প্রতিশ্রুতিতে বেধে দিল আমায়। দেখা করতে হবে বিকেলে।

রিকশায় উঠতে যাবো এমন সময় সে আমাকে হতবাক করে দিয়ে মিষ্টি হেসে তার ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিল। বললো, আমায় যতোটা বেরসিক ভাবো, আমি আসলে ততোটা নই।

প্রিয়তমের প্রথম উপহার দেহমনে এক অদ্ভুত শিহরণ বইয়ে দিল। প্যাকেট খুলে দেখি শাড়ি। শাড়ি যে এতো সুন্দর হতে পারে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। হয়তো প্রিয়তমের স্পর্শে সেটি আরো মার্জিত হয়ে উঠেছিল।

সুন্দরী আমি কোনোকালেই ছিলাম না অথচ তার পরশ বোলানো শাড়িতে আমি যেন হয়ে গেলাম স্বর্গের অপ্সরা, যেন উর্বশী, রম্ভা। তার চোখের মুগ্ধতা যেন তাই বলে ভালোবাসার এতো রূপ কখনো দেখিনি। এই মুগ্ধতা যেন থাকে অনন্তকাল ধরে।

কাজিহাটা, রাজশাহী থেকে

উন্নতি

– পাঁপড়ী

ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছি আমার মা খুব অভিমানী। মাঝে মধ্যেই বাবার ওপর অভিমান করে তিনি খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। আমরা ভাইবোনেরা একটু একটু বুঝতে শেখার পর থেকে মায়ের রাগ বা এই অভিমান করে না খেয়ে থাকাটাকে খুব ভয় পেতাম।

এখন যেটুকু মনে পড়ে, খুব ছোটখাটো বিষয় নিয়ে বাবা মায়ের মান অভিমান হতো। বাবা-মা দুজনেই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাবার খুব পাখি শিকারের নেশা ছিল। ছুটির দিনে দেখা যেতো অন্য কোনো সহকর্মীর সঙ্গে খুব ভোরে শিকারে বের হতেন। তারপর একগাদা পাখি শিকার করে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যেতো। আজ থেকে পচিশ ত্রিশ বছর আগে বাসায় ফৃজ ছিল না। শুধু বাসায় কেন, আমাদের পাড়াতেই কোনো ফৃজ ছিল না।

যাহোক, মা কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় সারা রাত ধরে পাখিগুলো পরিষ্কার করে কষিয়ে রাখতেন।

আজীবন মায়ের মর্নিং স্কুল ছিল। সকালে উঠে মা না খেয়ে স্কুলে চলে যেতেন। তারপর এগারোটায় ফিরে কাজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরের রান্না শেষ করতেন। বাবা ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি যে রাতে পাখি শিকার করে ফিরেছেন এটা সহকর্মীদের মাঝে জানাজানি হয়ে যেতো। দেখা যেতো লাঞ্চ করতে আসার সময় বাবা চার পাচজন সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

মা গম্ভীর মুখে সবাইকে খাবার দিতেন। আমরা ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারতাম যে, মা সকাল থেকে না খেয়ে আছেন। দুপুরে বাবা খুব কম সময়ের জন্য লাঞ্চে আসতেন। তাই তখনো ব্যাপারটা তার চোখে ধরা পড়তো না। আমরা খেতে বসে মাকে খাবার জন্য অনেক সাধাসাধি করতাম। কিন্তু সব সময়ই ধমক খেয়ে সরে আসতে হতো।

বিকেলে স্কুল থেকে বাসায় ফিরে মাকে গুটিসুটি হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে বাবা প্রথমে যে প্রশ্নটি করতেন সেটা হচ্ছে, মণি, সামথিং রং?

মাকে ধরে ঝাকালেও মা কোনো কথার জবাব দিতেন না। আমরা ভাইবোনেরা এ সময়টার জন্যই অপেক্ষা করতাম যে, কখন বাবা ফিরবেন আর কখন মায়ের খাওয়া হবে।

বাবা এসে আমাদের কাছে জানতে চাইতেন যে, মা খেয়েছেন কি না। রাতে বিস্তর পাখি শিকার করে এনে মাকে কষ্ট দেয়ার ব্যাপারটা তখন তিনি বুঝতে পারতেন।

একবার এ রকম এক বিকেলে বাবা আমাদের তিন ভাইবোনকে বললেন, আমি খাবার রেডি করছি, তোরা তোদের মাকে বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আয় দেখি পারিস কি না।

আমরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। বাবা লজ্জা লজ্জা মুখ নিয়ে দাড়িয়ে আছেন। কি করবেন হয়তো বুঝতে পারছেন না। বড় ভাইয়া তখন ক্লাস নাইনের ছাত্র। বাবাকে বললেন, বাবা, আপনি নিজে গিয়ে ডাকেন, মা ঠিক এসে খেতে বসবেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, মা সত্যিই এসে বাবার সঙ্গে খেতে বসলেন।

আমার এমন অভিমানী মায়ের পেটে আলসার হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন দুই বেলা তাকে ওষুধ খেতে হতো। একদিন ওষুধ আনতে ভুলে যাওয়া নিয়ে দুজনের কথাকাটাকাটি হয়েছে। যথারীতি মায়ের খাওয়া বন্ধ এবং বাবার সঙ্গে কথা বন্ধ।

বাবা স্কুলে ছিলেন। মা ব্যাগ গুছিয়ে নিয়ে বাবার বাড়ি অর্থাৎ আমাদের নানাবাড়ি চলে গেলেন। নানাবাড়ি খুব বেশি দূরে নয়। আমার মায়ের অভিমানী স্বভাব সম্পর্কে নানা-নানি খুব ভালো ভাবেই জানতেন।

মাকে একা যেতে দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কিছু একটা হয়েছে। আমার মায়ের জন্মানোর আগে আমার নানা-নানির ছয়জন ছেলেমেয়ে মারা গিয়েছিল।

তাদের কেউ বা নানির গর্ভে আবার কেউ বা দুই চার মাস বয়সে মারা গিয়েছে। এ কারণে মাকে তারা খুব আদর দিয়ে বড় করেছেন।

বিকেলবেলা নানাবাড়ির কাজের ছেলেটা একটা চিঠি নিয়ে এসে হাতে দিল বাবাকে দেয়ার জন্য। চিঠিটা নানির লেখা। চিঠিতে তিনি বাবাকে যেতে লিখেছেন। তখন ভাইয়া বিকম পড়ছেন আর আমরা দুই বোন এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। কাজেই অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি।

বাবা স্কুল থেকে ফিরলে খোলা চিঠিটা বাবার হাতে দিয়ে বললাম নানাবাড়ি যেতে। আমরা শুধু ভাইবোনেরা থাকতে পারবো কি না এ নিয়ে বাবা সংশয় প্রকাশ করছিলেন। বাবাকে ভাইয়া অভয় দেয়াতে বাবা যেতে রাজি হলেন। পরদিন মাকে সঙ্গে নিয়ে বাবা বাসায় ফিরলেন। দেখলাম তখনো মা বেশ গম্ভীর। তেমন হাসি-খুশি ভাব নেই।

কয়েকদিন পরে ছিল কোরবানির ঈদ। হঠাৎ মনে হলো, শাড়ির প্রতি মায়ের দুর্বলতার কথা। তাই বাবাকে বললাম, মার মুড ভালো করতে একটা শাড়ি কেনার কথা।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিউ মার্কেটে গিয়ে বাবা পছন্দ করে একটা শাড়ি কিনে আনলেন।

শাড়িটা মায়ের হাতে দিতেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। শাড়িটা মায়ের পছন্দ হয়েছে কি না জানতে চাইতেই মা হেসে দিয়ে বললেন, এতোদিনে তোর বাবার পছন্দের উন্নতি হয়েছে।

রাধানগর, পাবনা থেকে

আত্ম ধিক্কার

– লাভলি খাতুন

আসলে শাড়ি আমার মোটেও পছন্দ নয়। কারণ গত বছর শাড়ি নিয়ে আমাকে বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল। যাহোক, ঘটনাটা বলি।

গত বছর সবেমাত্র ক্লাস নাইনে উঠেছি। নতুন যৌবন, সব সময় মন শুধু উড়ু উড়ু করে। শাড়ি আমার মোটেও পছন্দ নয়। অথচ অনুষ্ঠানে আপু আর হবু ভাবী আমাকে শাড়ি পরিয়ে নিয়ে যাবেন। শাড়িতে নাকি আমাকে পরীর মতো দেখায়। আমি তো কিছুতেই শাড়ি পরবো না। শেষ পর্যন্ত তাদের জোরাজুরিতে শাড়ি পরে অনুষ্ঠানে গেলাম। কেমন সব সময় অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব। মনে হচ্ছে যেন আমার কোমরে বোঝা চেপে আছে। কিন্তু কিছুই পরিনি। শাড়ি ধরে সাবধানে হাটছি।

বিয়ে বাড়ি সর্বত্র লোকে লোকারণ্য। যদিও চুপচাপ বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না তবুও শাড়ির জন্য বসে থাকতে হচ্ছে। শেষে আমার বান্ধবী এসে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে গেল। বান্ধবীর সঙ্গে আমাকে দেখে তার ক্লাস টেনে পড়ুয়া ভাই ড্যাব ড্যাব করে তাকাতে লাগলো। তার দিকে তাকাতে গিয়ে পিছলে পড়ে গেলাম। আর শাড়ি, পেটিকোট আমার কোমর পর্যন্ত উঠে গেল। সেদিন আবার প্যান্টি পরিনি। কি লজ্জাকর ব্যাপার!

লোকজন আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো। কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা পাওয়ায় উঠে দাড়াতে পারছিলাম না। বান্ধবীর ভাই আমাকে উঠতে সাহায্য করলো এবং কানে কানে বললো, কি সুন্দর গোপন অঙ্গ তোমার! স্তন দুটি নিশ্চয় আরো সুন্দর!

আমি তার কথা শুনে তাকে একটি থাপ্পড় দিয়ে দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম। এবং শাড়ি পরে যাওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

হরিনগর থেকে

তুলনাহীন

– নাসীম চৌধুরী

এই শাড়ির মর্ম বাঙালি তথা উপমহাদেশের মানুষরাই ভালো বোঝে। আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনের মানুষরা চিরদিনই চমৎকৃত ও মুগ্ধ হয়েছে এই লম্বা কাপড়ের টুকরোর মোহময় ব্যবহার দেখে। তাই তো একবার আমার এক বিদেশি বন্ধু অবাক হয়ে বলেছিল, It's amazing how beautifully you wrap around such a long piece of cloth and look so elegant.

তাই তো বলি, শাড়ি হচ্ছে পৃথিবীর Most simple but elegant and sexy yet sober dress! এর কোনো তুলনা নেই।

চট্টগ্রাম থেকে

আইরিশ পরী

– মোহাম্মদ বদরুল ইসলাম

মাস্টার্সের রেজাল্ট আউটের রেশ কাটতে না কাটতেই বৃটিশ এক কম্পানিতে আমার চাকরি হয়ে যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের শাখা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চাকরির তিন মাসের মাথায় সুযোগটা এলো। আমাদের কম্পানি এশিয়া থেকে তিনজনকে আয়ারল্যান্ডে ছয় মাসের একটি প্রফেশনাল কোর্সের জন্য মনোনীত করলো। বাংলাদেশ থেকে সুযোগটা পেলাম আমি। এ ছাড়া ভারত থেকে রাহুল এবং চায়না থেকে ঝুং ঝিও মনোনয়ন পেল। আমাদের তিনজনেরই মনোনয়নের প্রধান যোগ্যতা কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্ট। সবগুলো ফার্স্ট ক্লাস।

ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটির জেনেটিক্সের ছাত্রী শ্যারন উইলিয়ামস–এর সঙ্গে পরিচয় ওখানেই, তাদের ডিপার্টমেন্টের জার্মপ্লাজম কালেকশন দেখতে গিয়ে। ডাবলিন কেন, ইওরোপেই আমি নতুন এবং বিশেষ কোনো স্বজনও ওখানে নেই জেনে শ্যারনই যে কোনো সময় সহযোগিতার আশ্বাস দিল। জেনেটিক্স ছাড়াও বিভিন্ন সোসাইটির কালচারের প্রতি রয়েছে তার গভীর আগ্রহ। আমার লেখাটি এ বিদেশি মেয়েকে কেন্দ্র করেই।

ডাবলিনে শ্যারনকে একজন স্টার বলা চলে। প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ডাবলিনে ফুলের শুভেচ্ছা জানানোর পর সে সুপরিচিত। পাচ ফিট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার স্লিম একহারা ফিগার ছাড়াও রয়েছে চমৎকার বাচনভঙ্গি। কথা বলার সময় গভীর কালো দুই চোখ আর তেমনই মেঘ বরণ সিল্কি কালো চুলগুলোও যেন অপরূপ হাসির সঙ্গে হাসে। আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ায় প্রথম প্রথম শ্যারন আমাকে উদ্ভিদ তাত্ত্বিক সংগ্রহশালাগুলোতেই বেশি নিয়ে যেতো। সপ্তাহে দুদিন আমাদের উভয়েরই ছুটি। বেড়ানোর ফাকে ফাকে আমরা একে অপরকে নিজেদের কালচার সম্পর্কে বলতাম, বিশেষত শ্যারন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে শুনতো আমাদের কালচার সম্বন্ধে।

ইওরোপিয়ান মেয়েরা খুব দ্রুত ফৃ হয়ে যায় যা আমাদের দেশে ভাবাই যায় না। একদিন আনজিয়ার স্ট্রিট দিয়ে হাটছি। হঠাৎ আমার দুই চোখ আটকে যায় ওপাশের একজোড়া তরুণ–তরুণীর প্রতি। মেয়েটির শার্টের বোতাম খুলে বুকে মুখ গুজে আছে ছেলেটি। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিলাম। শ্যারন আমাকে মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলো, লজ্জা পেলে নাকি?

বললাম, আমাদের দেশের বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের বিয়ের আগে এ অভিজ্ঞতা হয় না। এমনকি আমারও নেই। বিয়েপূর্ব প্রেম অধঃপতন হিসেবে ধরে নেয়া হয়।

শ্যারন অদ্ভুতভাবে তাকালো আমার দিকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন নতুন দেখছে আমাকে। রসিকতা করে বললাম, এভাবে দেখছো কেন – আমি? তুমি একই প্রজাতি। হোমো স্যাপিয়েন্স।

সে হাসলো এবং বললো, আমি ভাবছি তোমাদের দেশের মেয়েগুলোর কথা। অমন সুদর্শন এবং মেধাবী এক যুবককে চুমু না দেয়ার আকর্ষণ কিভাবে রোধ করলো তারা?

বললাম, যেভাবে তুমি রোধ করে আছো।

তাই নাকি বলেই আমার মাথা টেনে নামিয়ে হঠাৎ গালে চুমু বসিয়ে দিল।

শ্যারনকে বললাম, আমাদের দেশে শতকরা নিরান্নবইটি বিয়েই আমরণ টিকে থাকে এবং এটা বিয়েপূর্ব প্রেমের অবাধ সুযোগহীনতারই ফল। আমি আরো বললাম, আমাদের দেশে পারিবারিক সেতুবন্ধনটি খুবই গাঢ়। স্বাবলম্বী হওয়ার পরও ছেলেরা মা-বাবা, এমনকি ভাইদেরও ছেড়ে যায় না। মা-বাবার মৃত্যুর পর সেপারেশন হয়, তার আগ পর্যন্ত সন্তানরা তাদের দেখাশোনা করে।

এভাবে প্রতিদিনই আমাদের সংস্কৃতির বর্ণনা চললো। এশিয়ানদের প্রতি ইওরোপিয়ানদের তাচ্ছিল্যের মনোভাবটি আমাকে আরো তাতিয়ে তুললো। একদিন বললাম, আমাদের দেশে এমন কোনো বিবাহিত মেয়ে নেই যে শাড়ি পরেনি। সাধারণত বিয়ের পরে মেয়েরা শাড়ি পরে। অনেক গ্রামাঞ্চলে যৌবন প্রাপ্তির পরই মেয়েরা শাড়ি পরতে শুরু করে। এটি একটি বিশেষ পোশাক। বিয়ে, ফাংশন কিংবা পার্টিতে মেয়েরা শাড়িকেই অগ্রাধিকার দেয়।

সে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল আর ক্রমশই আমাদের সংস্কৃতির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধও লক্ষ্য করলাম। শাড়ির প্রতি তার যথেষ্ট আগ্রহ চেপে রাখতে না পেরে শ্যারন তার ডাগর দুই চোখ আমার ওপর রেখে বললো, সেই পোশাকটি কেমন? শাড়ির বর্ণনা দিতেই সে যেন নেচে উঠলো। বললো, ডাবলিনে কি এটা পাওয়া যাবে?

মনে হয় না। তবে আমার বন্ধু নেক্সট উইকে তার দেশ ইনডিয়া যাচ্ছে, তোমাকে আনিয়ে দেবো।

রাহুল দেশে এলেও আমি ফিরলাম না, বরং তিন মাস পর এই এক সপ্তাহের ছুটিটা আইরিশদের জীবনযাত্রা এবং আয়ারল্যান্ডের চমৎকার নৈসর্গিক শোভা দেখার জন্য রেখে দিলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা, অমন রূপসী শ্যারনের সান্নিধ্যও আমাকে টানছিল। ইতিমধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিল। শাড়ি পরতে প্রয়োজন ব্লাউজের এবং সেটাও হতে হবে মাপ মতো। কিন্তু শ্যারনের ব্লাউজের মাপ কোথায় পাবো? তাছাড়া ব্লাউজের মাপ কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় সেটাও আমার জানা ছিল না। অনেক ভেবে শেষমেশ দেশে এক ভাবীকে ফোন করলাম।

জেনেটিক্সে মেয়েদের ব্লাউজের সাইজ সংক্রান্ত কোনো চ্যাপটার আছে নাকি? মিনুভাবী বললেন।

আইরিনের কথা বললাম।

তার মতোই হবে বয়সে? নাকি স্বাস্থ্যে? বুকের মাপ নিয়েছো? ভাবী আরো দুই ডিগ্রি বাড়িয়ে ফাজলামো করলেন। এই ফাকে শাড়ি পরার পদ্ধতিটাও জেনে নিলাম।

পেপারস রেডি, টিম ভিজিট এবং ওয়ার্কশপ এসবের ব্যস্ততায় দিন কাটছে দ্রুত আর ফাকে ফাকে শ্যারনের ছবি ভাসে চোখের মাঝে। তাকে আগের চেয়ে আরো সুন্দর মনে হয় আমার। দৃষ্টি মনে হয় আরো গভীর। শ্যারনকে আমাদের দেশের কথা বলি। বলি ফাগুনের ফুল, কুহুতানের কথা, আষাঢ়ের প্রথম বৃষ্টি, শ্রাবণের বরিষণ, আশ্বিনের ঘন নীল আকাশ এবং শীতের কুয়াশা ভেজা সকালের কথা। শ্যারন তন্ময় হয়ে শোনে। বলি কার্তিকের নবান্নের কথা, ঘরে ঘরে পিঠা তৈরির কথা, বধূদের বাপের বাড়ি *নাইওর* যাওয়ার কথা, পহেলা বৈশাখের কথা। লাল পেড়ে শাড়ি পরে হাজার হাজার নারীর রমনার বটমূলে জড়ো হওয়ার কথা। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যায় এবং অবাক হয়ে এতো সৌহার্দ এবং পারস্পরিক মমতা দেখে। আমার গর্বে বুক ভরে যায়। সবুজ ধানক্ষেত, হলুদ সর্ষে ফুল এবং লাল পলাশ শিমুলের গল্প করি।

শ্যারনের প্রকৌশলী বাবা বার্মিংহামে থাকেন। স্কুল টিচার মা থাকেন তার সঙ্গে। এক উইকএন্ডে আমন্ত্রিত আমি এক তোড়া ফুল আর চারটি শাড়ি, সঙ্গে ম্যাচিং করা পেটিকোট–ব্লাউজসহ নিয়ে তাদের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হলাম। সে নিচ তলার করিডোরে অপেক্ষায় ছিল। গোলাপি ড্রেসে তাকে অপূর্ব লাগছিল। আমি প্যাকেট এবং ফুল বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, গুড মর্নিং।

শাড়ির প্যাকেট খুলে শাড়িগুলো উল্টে–পাল্টে দেখতে লাগলো সে কোনো অপরিচিত স্পিসিস শনাক্তকরণের জন্য। নীল রঙের ওপর সোনালি পাড়ওয়ালা শাড়িটা হাতে নিয়ে বললো, এটা আজ পরবো এবং তোমাকে নিয়ে ঘুরবো, ছবি তুলবো।

আমার সীমিত জ্ঞানে বিশেষজ্ঞের মতো কিভাবে শাড়ি পরতে হয় তা শ্যারনকে বলে দিলাম। সে অন্য একটি রুমে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর সে আমায় ডাকলো। ভেতরে ঢুকে থতমত খেয়ে গেলাম। কেবল পেটিকোট আর ব্রা পরে ব্লাউজ হাতে দাড়িয়ে আছে সে। তার ফর্শা গোলাপি দেহ থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মানুষ এতো সুন্দর হয়! মেদহীন কোমর, টান টান বুক, পীনোন্নত পয়োধর আর ভরাট নিতম্ব আমার ছাব্বিশের যৌবনে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ বইয়ে দিল। মেরিলিন মনরো কিংবা ক্লিওপাট্রা বোধহয় এ রূপের কাছে সহজেই হার মানতেন।

শ্যারন ইশারায় কাছে ডাকলো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো পলকহীন চোখে তার দিকে এগোলাম। কাছে যেতেই সে বললো, এটার (ব্লাউজের) কাটা অংশটা সামনে না পেছনে?

সামনে। আমি বললাম।

পেটিকোটের জিপার নেই কেন? সে অনুযোগ করলো।

আমার হাসি পেল। দেখলাম সে পেটিকোটের কাটা অংশ প্যান্টের মতো সামনের দিকে রেখে জিপার খুজছে। বললাম, এগুলোতে জিপার থাকে না। অস্বস্তি হলে কাটা অংশটা কোনো এক পাশে রেখে দাও। অতঃপর মিনুভাবীর রেসিপি মতো শাড়িখানি শ্যারনের দেহে পেচিয়ে দিলাম। দেখলাম, মোটামুটি পারফেক্টই হয়েছে।

শাড়িতে শ্যারনকে অপরূপা লাগছিল। পরীরাই বোধহয় এতো সুন্দর হয়। সে বিশাল আয়নার সামনে দাড়িয়ে ঘোরলাগা চোখে তাকিয়ে আছে এবং নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। আমার দিকে ফিরে বিশ বছর বয়সী শ্যারন অপলক চেয়ে রইলো। তারপর বললো, ইটস নট সিম্পল। ইটস রিয়ালি এ গ্রেট ড্রেস, এলিগ্যান্ট ড্রেস।

এক সময় আমরা বাইরে বের হলাম। তাকে দারুণ খুশি খুশি লাগছিল। মনে হচ্ছিল সে যেন হাটছে না, উড়ে চলছে। শাড়ির আচল বার বার খসে পড়ছে তো বার বার সেটা সে টানছে। এও এক দারুণ দৃশ্য। আমি চোখ ফেরাতে পারছি না! এ রূপের নেশা কে–ই বা কাটাতে পারে। বললাম, বেন জনসন হলে তার কবিতাটি এভাবে লিখতেন,

Wear sari, and stay in front of mine
And I'll not look for the wine.

সে হেসে উঠলো, মুগ্ধতা জাগানিয়া হাসি। মনে হলো ডাবলিন গাছের পাতাগুলো আরো সবুজ হলো। আমরা হাটছি। এক সময় বললাম, আমাদের দেশের স্ত্রীরা কোথাও যেতে বা বসতে তাদের স্বামীকে সব সময় ডান পাশে রাখে। এটা একটা সংস্কার।
কচি ফ্লাশ গৃন তৃণের ওপর দাড়িয়ে সে বললো, বাহ, চমৎকার তো! তো কি কারণে?
বললাম, মনে করা হয় এ না হলে স্বামীর অমঙ্গল হয়...।
ন্যাশনাল পার্কের গাছের ছায়ায় এবার সে আমার মুখোমুখি দাড়ালো, বললো, তুমি এবং তোমাদের সোসাইটি ও কালচার যতোই জানছি ততোই মুগ্ধ হচ্ছি। ভালোবেসে ফেলেছি তোমার এবং তোমাদের সব কিছুকে। আমি তোমায় ভালোবাসি ইসলাম, গভীর ভালোবাসি। আর এখন থেকে তুমি সব সময় আমার ডান পাশে থাকবে।
বলেই সে আমার বাম পাশে গিয়ে তার ডান হাত দিয়ে আমার কোমর জড়িয়ে হাটতে লাগলো।

পাতিলা সাঙ্গন, মৌলভীবাজার থেকে

যেহেতু না সেহেতু না কিন্তু না

– মোহাম্মদ মনজুরুল ইসলাম কাজল

প্রিয় রাধা,
তোমাকে শাড়ি কিনে দিতে চেয়েও দিইনি বলে রাগ করো না। তোমার আকাঙ্ক্ষিত, আলোড়িত, অবধারিত, আশ্চর্যান্বিত, আমোদিত আবদার অবশ্যই শাড়ি কিনে দিয়ে পূরণ করবো। এরপর অবশ্যই এ রকম অচিন্তনীয়, অলঙ্ঘনীয়, অনাকাঙ্ক্ষিত, অসহনীয়, অগ্রহণযোগ্য ভুল হবে না।
যেহেতু না, সেহেতু না, কিন্তু না এবং না, হঠাৎ না, তথাপি না, সুতরাং না, তারপরও না, পকেটে টাকা থাকলেও না, না থাকলেও না, ভাত খেলেও না, রুটি খেলেও না, সিগারেট না খেলেও না, হেটে গেলেও না, বাসে উঠলেও না, লঞ্চ ডুবিতে মরে গেলেও না, হায়াত-মউত শেষ হয়ে গেলেও না, না গেলেও না, ঘুমিয়ে গেলেও না, জেগে থাকলেও না, মাথা ধরলেও না, টুইন টাওয়ার ধ্বংস না হলেও না, তুমি আমার সঙ্গে কথা না বললেও না, যায়যায়দিন পড়লেও না, না পড়লেও না, বৃষ্টি হলেও না, রোদ হলেও না, নির্জন দুপুরে একা চিল উড়ে গেলেও না, বহুদূরে থাকলেও না, জেমস-এর গান শুনলেও না, অভিমান হলেও না, না হলেও না, পৃথিবী উল্টে গেলেও না, পৃথিবী উল্টে না গেলেও না, একা একা কষ্ট পেলেও না, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিলেও না, না দিলেও না, চা খেলেও না, কোক না খেলেও না, তুমি ফোন করলেও না না, করলেও না, বিটিভি দেখলেও না, একুশে টিভি না দেখলেও না, রাত হয়ে গেলেও না, মরে গেলেও না, যেহেতু না, সেহেতু না, অযথা না, তথাপি না এবং না, কদাচিৎ না, সুতরাং না, হঠাৎ না, কিন্তু না, প্রমাণিত না।
কি বিশ্বাস হলো তো এবার শাড়ি কিনে দেবো? এবার হাসো আনন্দে খুশিতে।
ইতি – তোমার কৃষ্ণ

শংকর, রায়েরবাজার, ঢাকা থেকে

চার ক্ষণ

– আয়শা ইসলাম

এক.

আমার আম্মার পচিশতম বিয়েবার্ষিকীতে একটা শাড়ি পরেছিলেন। শাড়িটা ছিল সোনা–রূপা দিয়ে তৈরি। এ শাড়ি আমার দাদির বিয়ের শাড়ি। এই শাড়ির মতো ঠিক এমনি একটি শাড়ি জাদুঘরে অনেক আগে দেখেছি। বেগুনি রঙের এই শাড়িটা এক বিয়ে অনুষ্ঠানে পরেছি। কালের চক্রে দিন চলে গেছে। আজ আমার দাদি নেই, মা নেই। আছে সেই শাড়িটি।

দুই.

আম্মার বিয়ের শাড়িটি ছিল মসলিন শাড়ি। এখন সেই শাড়ি পরা যায় না। তবুও আলমারিতে তোলা আছে।

তিন.

আমার বিয়ের প্রথম ঈদে আমাকে অ্যাশ রঙের শাড়ি দিল। তাই দেখে আমার মন খারাপ। অন্য কোনো ঈদে দিতো এই রঙ। এখন দিল কেন? শাড়ি নিয়ে ব্লাউজ আনতে গেলাম তখন আশপাশে কেউ না কেউ প্রশ্ন – এ শাড়িটা কোথা থেকে কিনেছেন? যা সুন্দর!

ঈদের দিনে ওই শাড়িটা পরলাম। সবাই আমার শাড়ি প্রশংসা করলো আর আমার মন আনন্দে ভরে উঠলো। এ শাড়িটা ননদের ছেলে আরিফের পছন্দে কেনা।

চার.

কোথাও বেড়াতে গেলে তিন বছরের ছেলে তকিকে বলি, আব্বু কোন শাড়িটা পরবো। ওর উত্তর, আম্মু বৌ শাড়ি পরো।

বঙ্গভবন স্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা থেকে

অনুভব

– খালেদ বিন রশিদ

ছোটবেলা থেকে একটু মা ঘেষা ছিলাম। মা যেখানেই বসে থাকতেন, আমিও মাকে ঘেষে সেখানেই বসে থাকতাম। এই কারণে কতো মার খেয়েছি। যখন একটু বড় হলাম তখনো এই অভ্যাসটা ছিল। ফলে মায়ের শরীরের গন্ধটা আমার কাছে বেশি পরিচিত ছিল। চোখ বন্ধ করে গন্ধ শুকেই বলে দিতে পারতাম মা আশপাশে আছেন কি না। মায়ের শরীরের গন্ধটা মায়ের শাড়িতেও পেতাম। একশটা শাড়ির ভেতর থেকেও গন্ধ শুকে মায়ের শাড়িটা আলাদা করতে পারতাম।

আমার মায়ের ডায়বেটিস, প্রেসার, হার্টের অসুখ সবই ছিল। আমার নানারও এই অসুখগুলো ছিল। মা মাঝে মধ্যে ঠাট্টা করে বলতেন পৈত্রিক সম্পত্তি না পেলেও পৈত্রিক অসুখ সবগুলোই পেয়েছি। মায়ের প্রায়ই বুকে ব্যথা উঠতো। তখন মা আমার কেমন হয়ে যেতেন। বুকে প্রচণ্ড ব্যথা, হাত–পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতো, কপালে ঘাম জমতো। আমরা চার ভাই–বোন ও আমার বাবা তখন মায়ের সেবা–যত্ন করতাম। পরে আস্তে আস্তে ব্যাথাটা কমে আসতো।

একদিন রাতে মায়ের বুকের ব্যথাটা প্রচণ্ডভাবে উঠলো। আর কিছুতেই ভালো হলো না। ডাক্তার–কবিরাজ কতো কিছু করলাম। ঘাতক ব্যাধিটা চিরদিনের জন্য মাকে নিয়ে গেল। পড়ে থাকলো শুধু তার স্মৃতি। মায়ের শাড়িগুলো যত্ন করে আলমারিতে তুলে রাখলাম। প্রায়ই চুপি চুপি করে করে গন্ধ শুকতাম, অনুভব করতাম মাকে।

মা মারা গেছেন প্রায় ১২ বছর। আমরা অনেক বড় হয়েছি। আমি কলেজের প্রভাষক। ভাই ডাক্তার। সবাই ভীষণ ব্যস্ত। শত ব্যস্ততার মাঝেও মনে পড়ে মাকে। তখন মায়ের শাড়িগুলো বের করে নাড়াচাড়া করি, গন্ধ শুকি, খুজি আমার মাকে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সময়ের চাকায় পিষ্ট হয়ে শাড়িগুলো মলিন হয়ে গেছে। মায়ের গায়ের গন্ধও আর পাই না। তারপরও শুকি, শুকতেই থাকি। চেষ্টা করি অনুভব করার আমার মায়ের গন্ধ, মায়ের গায়ের গন্ধ, শাড়ির গন্ধ।

মিশনপাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে

কলঙ্কিত

– অনামিকা

বাবার ও শশুরের ইচ্ছায় চোদ্দ বছর বয়সেই আমার বিয়ে হয়ে যায়। একদিকে ছোট, অন্যদিকে বাবার ইচ্ছা আমাকে লেখাপড়া শেষ করাবেন। তাই বাবার বাড়িতেই আমার অবস্থান। স্বামী ঢাকায় থাকেন, আমি চট্টগ্রামে। বিধাতার মেহেরবানিতে বিয়ের প্রথম বছরেই মা হলাম। ছেলের বয়স যখন দুই মাস তখন তার নিউমোনিয়া হয়, অবস্থা খুবই খারাপ। ডাক্তার বাচার আশা ছেড়েই দিয়েছেন। আশপাশের লোকজন বাচ্চাকে দেখতে আসছে। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তারও ছিলেন। আমাদের উপরের তলায় থাকতেন, আমার মাকে ভাবী ও বাবাকে ভাই বলে ডাকতো। আমিও তাকে চাচা ডাকতাম। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ বছর হবে।

ছেলের অসুখের খবর স্বামীকে দিতে হবে। বাসার ফোন নষ্ট ছিল বলে বাইরে গিয়ে ফোন করার সিদ্ধান্ত নিলাম। চাচা আমাকে বললো, আমিও মেডিকালে যাবো, চলো, এক সঙ্গে বের হই।

তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এতোই ভালো ছিল যে বিশ্বাস করাটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। চাচারা বাবার সমতুল্য। তাই তো আমাকে টেলিফোন অফিসে তিনি নিয়ে গেলেন। আমার স্বামীর সঙ্গে কথা শেষ করে চাচাকে বললাম একটা ট্যাকসি ডেকে দিতে। চাচা ট্যাকসি নিয়ে এলেন এবং নিজেও উঠে বসলেন। কারণ তার নাকি আজ কোনো কাজ নেই। তাই বাসায় চলে যাবেন।

কিছু দূর আসার পর ট্যাকসি মাদারবাড়ির দিকে ঢুকলো।

এখানে কেন?

জিজ্ঞাসা করতেই চাচা বললেন, আমার বোনের বাসায় একটু কাজ আছে।

বললাম, আমি বাসায় যাবো, মা চিন্তা করবেন।

চিন্তা করবে কেন? আমি তো সঙ্গে আছি।

বললাম, তাহলে আপনি যান, ট্যাকসিতেই আমি থাকি।

তিনি ট্যাকসি থেকে নেমে উপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার আপা বারান্দায় দাড়িয়ে আছেন। তুমি এখানে বসে থাকলে খারাপ দেখায়, প্লিজ চলো।

ট্যাকসি থেকে নেমে তার পিছে পিছে গেলাম। বাসাটা সম্ভবত তিন চার তলায় হবে। একটা ছেলে এসে দরজা খুলে দিল, আমাকে ড্রইং রুমে বসতে বলে চাচা ভেতরের রুমে গেলেন এবং কয়েক সেকেন্ড পরেই ফিরে এসে ওই দরজা খুলে দেয়া ছেলেটাকে দোকানে পাঠালেন।

বললাম, কই, চলেন।

এ কথা বলতেই তিনি এসে আমার পাশে সোফায় বসে আমার একটা হাত তার হাতের মধ্যে চেপে ধরলেন। আমার দিকে রাবণের দৃষ্টিতে তাকালেন। ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না, বুঝতে আর বাকি রইলো না আমি এক নরপশুর হাতে পড়েছি।

তাকে দেখলে কেউ এতো নিচু চরিত্রের লোক ভাবতেই পারবে না। কারণ, লেখাপড়ায়, আচার–ব্যবহারে, চেহারায় সব মিলিয়ে সে এক সুন্দর সুপরুষ। আমি কেদে কেদে অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। কোনো লাভ হলো না। কষ্টে, ঘৃণায় পাথর হয়ে গেলাম, আমাকে জড়িয়ে ধরে তিনি নিচে শুইয়ে দিলেন।

তার সঙ্গে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধস্তাধস্তি করি। এক সময় আমার শাড়ি ও তার প্যান্ট ভিজে নরপশুর শক্তির অবসান হলো।

আমি উঠে দরজা খুলে দৌড়ে নিচে নেমে এলাম। তিনি পেছন থেকে দাড়াও দাড়াও, চিৎকার করলেন। আমি আর পেছন ফিরিনি। ট্যাকসি নিয়ে সোজা বাসায়।

ট্যাকসিতে বসে খেয়াল করলাম দুধ বের হয়ে আমার সারা বুক ভিজে গেছে। চিৎকার করে কান্না আসছিল। আমার কান্না দেখে ড্রাইভার বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল কি হয়েছে।

বাসায় এসে শাড়িটা জানালা দিয়ে নালায় ফেলে দিয়েছি। গোসল করে ছেলেকে কোলে নিয়ে দুধ মুখে দিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরে চিৎকার করে কেদেছি। মা হয়তো ভেবেছেন, ছেলের অসুখ তাই আমি কাদছি। তারপর বিকেলে সেই নরপশু আমাদের বাসায় আসে এবং অল্প কিছুক্ষণ থেকে চলে যান। অন্যদিনের মতো মা, বাবার সঙ্গে গল্প করেননি। লোকে বলে অপরাধীর মন ছোট থাকে। তাকে দেখে ওই দিন বুঝেছিলাম, কথাটা কতোখানি সত্য। এরপরে বেশ কয়েকবার আমাকে সরি বলতে চেয়েছিলেন। আমি শুনতে চাইনি। কখনো আর তার চোখে চোখ পড়েনি। এবং ওই ঘটনার কয়েক মাস পর আমরা ঢাকা চলে আসি।

এতো বছরের সেই পুরনো ঘটনা, যখন মনে পড়ে, মনে হয় এখনি ঘটেছে, আর একটা কথা খুব মনে পড়ে, একজন অশিক্ষিত ট্যাকসি ড্রাইভার ওইদিন আমার দুঃখ শেয়ার করতে চেয়েছিল অথচ একজন সুশিক্ষিত সমাজসেবক আমার কান্নায় বিচলিত হয়নি। এক অসহায় নারীর চোখের পানিতে তার মন

গলেনি। একটা মুত্যুমুখী সন্তানের মায়ের করুণ আকুতি তার কানে পৌছায়নি। ধিক, তোমার শিক্ষাকে, ধিক।

আমি সব ধরনের ড্রেসই পরি। তার মধ্যে শাড়িটা আমার বেশি প্রিয়। চান্স পেলেই শাড়ি পরি। আর পরতে গেলেই সেই কলঙ্কিত শাড়িটার কথা মনে পড়ে যায়। নিজের অজান্তেই চোখ ভিজে আসে।

পাঠকরা হয়তো ভাবছেন, সেই অসুস্থ বাচ্চাটার কি হলো। আল্লাহ দয়াময় বলে একজন দুঃখী মাকে তিনি আরো দুঃখ দিতে চাননি। সে আল্লাহর রহমতে ও সবার দোয়ায় বেচে আছে। সে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছে। তার জন্য সবাই দোয়া করবেন যেন একজন সৎ চরিত্রবান পুরুষ হয়, দেশ ও দশের জন্য যেন ভালো কিছু করতে পারে।

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ইঞ্জিন বোটে

– তাসনুভা জেরিন চৌধুরী নিশিতা

১৯৮৭ বা ৮৮ সালের ঘটনা। যতোদূর মনে পড়ে, নৌকায় ইঞ্জিন লাগিয়ে নৌকার গতিকে যখন দ্রুত গতির করা হলো ওই সময়ের ঘটনা। শাড়ি পরা একজন মহিলা সামান্য একটু অসতর্কতার জন্য কতোটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে সেই সঙ্গে উপস্থিত অন্য সবার মাথা লজ্জায় হেট হয়ে যেতে পারে সেটা বোধহয় প্রত্যক্ষদর্শী না হলে কোনোদিন ভাবনাতেও আসতো না।

আমার নানাবাড়ি সাভারের চাকুলিয়া গ্রামে। যেতে হয় মিরপুর বৃজের নিচ থেকে ইঞ্জিনচালিত বোটে। সবেমাত্র ইঞ্জিনচালিত বোট চালু হয়েছে। কম বেশি সবাই উৎসুক যাত্রী। প্রায় চল্লিশ জনের মতো যাত্রী। এর মধ্যে দশ বারোজন মহিলা যাত্রী। বোটে বসার নিয়ম হচ্ছে, ভেতরের দিকে বসবে সমস্ত মহিলা যাত্রী আর বাইরের দিকে বসবে পুরুষ যাত্রী। যাত্রী বেশি হওয়াতে এমনভাবে বসতে হলো যে, মহিলা যাত্রীরা ইঞ্জিনঘেষা।

বোট যখন নদীর মাঝামাঝি চলে এলো তখনই ঘটলো ঘটনাটা। আমাদের বোটটিকে ক্রস করলো অন্য একটি বোট। আর ওই বোটের ঢেউ এসে যখন লাগলো আমাদের বোটে তাতে আমাদের বোটটি সামান্য কাত হয়ে গেল। বোট কাত হওয়াতে রহিমাখালাও (যাকে নিয়ে ঘটনা) একদিকে ঝুকে পড়লেন। যখনই ঝুকে পড়লেন তখনই খালার শাড়ির আচলটি ইঞ্জিনের যে রডটি পানির পাখার সঙ্গে যুক্ত ওই রডের একটি নাটের সঙ্গে পেচিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে খালার শাড়িটি কিভাবে খুলে ওটার সঙ্গে পেচিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল কেউ-ই বুঝে উঠতে পারলো না। এদিকে খালা শাড়ি সামলাবেন, নাকি বাতাসে উড়ন্ত পেটিকোট ঠিক রাখবেন বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পেটিকোটের বাধন গেলো খুলে।

এই ঘটনাগুলো যে এতো তাড়াতাড়ি ঘটলো তাতে অন্য কেউ যে সাহায্য করবে তারও সুযোগ নেই যদিও সবাই দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলছে, ধর ধর, কিন্তু কেউ আর ধরছে না। ইতিমধ্যে খালার অনাবৃত নিম্নাংশ সবার দৃষ্টির গোচরে। এ অবস্থায় উপস্থিত সকল যাত্রীর চেহারার ভাবের বহিঃপ্রকাশ কি ছিল

সেটা হয়তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলে বোঝাতে পারতেন, লিখতে পারতেন। কিন্তু আমার এই ছোট পরিসরে সেটা সম্ভব নয়।

পশ্চিম নাখালপাড়া, ঢাকা থেকে

দশ হাত রাগ

– দেলোয়ারা বেগম

ঘটনাটি প্রায় ত্রিশ বছর আগের। ভুলেই গিয়েছিলাম। যাযাদির শাড়ি সংখ্যার আহ্বানে আবার মনে পড়লো। বাঙালি মেয়েদের শাড়ির প্রতি আকর্ষণ সব সময়ই দুর্নিবার। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমার তখন মাত্র নতুন বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে ঠিক মতো বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝেছিলাম যে, তার রাগ খুব প্রচণ্ড।

যাই হোক। একদিন সে আমার জন্য একটা শাড়ি কিনে আনলো যার জমিনটা ছিল গাঢ় সবুজ আর পাড়টা ছিল লাল। শাড়িটা আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। বললাম, কি এনেছো এটা? কাজের মেয়েদের মতো শাড়ি।

এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে শাড়িটাকে পুরোপুরি লম্বালম্বিভাবে টান দিয়ে ছিড়ে ফেললো। আমি তো হতবাক! বুঝতে পারলাম সে প্রচণ্ড রেগেছে। এও বুঝতে পারলাম, সে আমাকে আর শাড়ি কিনে দেবে না। ওই শাড়িটাকেই আমি আস্তে আস্তে রিপু করা শুরু করলাম। তখন দেশি শাড়িগুলো মোটামুটি দশ হাত বহর হতো। পুরো শাড়িটাকেই রিপু করেছি। অনেক দিন লেগেছিল শেষ করতে। একদিন আমার ভাইয়ের বন্ধু এলো আমাদের বাসায়। আমি তখন শাড়িটা রিপু করছিলাম। সে জিজ্ঞাসা করলো, কি হয়েছে?

আমি তাকে সব বললাম। সে শুনে হাসতে হাসতে বললো, তোর স্বামীর রাগ তো কম না, একেবারে পুরো দশ হাত।

সেই শাড়িটা আমি অনেক দিন পরেছিলাম। এখন চিন্তা করলে অবাক লাগে কিভাবে পেরেছিলাম অতো বড় শাড়িটাকে রিপু করতে! আসলে সময়ে সবই সম্ভব।

উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ থেকে

সেই সময়

– শিরীন খান

শাড়ি আমার প্রিয় পোশাক। টাঙ্গাইল, ঢাকাই জামদানি, রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী সিল্ক ভারী প্রিয় আমার। মনে পরে, যখন আমি ক্লাস এইটে পড়ি, একটা টাঙ্গাইল শাড়ির জন্য খুব জেদ ধরেছিলাম। মুগা সুতার কাজ করার শাড়ি, দাম ষোল টাকা। আব্বার পছন্দ ছিল না। বলেছিলেন, অনেক ভালো শাড়ি কিনে দেবেন। আরো বলেছিলেন, তোমাকে *মানে না মানা* শাড়ি কিনে দেবো।

সেকালে *মানে না মানা* শাড়ির খুব নাম ছিল। জরিপাড়, হাফ সিল্কের শাড়ির দাম ত্রিশ পয়ত্রিশ টাকা। আমি ওই ষোল টাকার শাড়ির জন্য একদিন না খেয়েছিলাম। ওই ষোল টাকার শাড়িটিই

আমাকে কিনে দিতে হয়েছিল। ওই শাড়ি কিনতে পেরে আমার কি যে আনন্দ হয়েছিল তা আজ বোঝাতে পারবো না। রাতে শাড়ি নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতাম। ঘুম থেকে জাগলে শাড়িখানাকে দেখতাম। প্রথম যেদিন শাড়ি পরেছিলাম সেটা ছিল আমার চাচির শাড়ি। ময়ূরের পেখম রঙ–এর সুতি, টাঙ্গাইল তাতের। স্কুলে কিৎ কিৎ খেলে শাড়িটা ছিড়ে ফেলেছিলাম। বাসায় ফিরে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছিল।

এরপর বেশ কয়েক বছর পার হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। পাকিস্তানি আমল। দোকানে একখানা শাড়ি কিনতে গেছি। লালপেড়ে একটা রাজশাহী সিল্কের শাড়ি কিনবো বলে ছোট ভাইয়ের বৌকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে গেছি। একটা লালপাড় রাজশাহী সিল্কের শাড়ি পছন্দ হলো। দাম আটাশি টাকা। দাম বেশি বলে দুইজনে বাসায় ফিরে এলাম। এতো দাম দিয়ে শাড়ি কিনবো?

বাসায় ফিরে দুইজনে বললাম, এখন কিনবো না, পরে দাম কমলে কিনবো। সে শাড়ি আর কেনা হয়নি। এখন মনে পড়লে হাসি পায়।

স্বামীর চাকরি করাচিতে। আমাকেও সেই করাচিতে চলে যেতে হলো। পাকিস্তানে সবে এসেছি। বিদেশে বাঙালিরা সবাই আপন। আমাকে কেউ আপা, কেউ ভাবী বলে ডাকতো।

আমাদের বাসার সামনেই থাকতেন এক বাঙালি ভদ্রলোক তার চার পাচটা মেয়ে ছিল। মেয়েরা সবাই আমাকে আপা বলে ডাকতো। তাদেরই বড় বোন এসে একদিন আমাকে বললো, আপা, আপনার কাছে একটি শাড়ি হবে? আমার বোনকে আজ দেখতে আসবে।

তাকে একটি ঢাকাই মসলিন শাড়ি দিয়েছিলাম। হালকা কমলা রঙ–এর শাড়ি। শাড়িটাতে মেয়েটাকে এতো সুন্দর লাগছিল তা এখনো ভুলতে পারি না।

মেয়ে পছন্দ হলো, বিয়েও হয়ে গেল। অনেক দিন পর মেয়েটার সঙ্গে দেখা। স্বামী সন্তান নিয়ে খুব ভালো আছে আর সুখে আছে। আমার খুবই ভালো লাগলো।

আমার খুব মনে পড়ে সেই অরেঞ্জ কালারের মসলিন শাড়িটার কথা। শাড়িখানা স্বাধীনতার পর পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সময় ফেলে আসতে হয়েছিল।

১৯৭১–এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে আমরা আটকা পড়লাম। ১৯৭৩ সালে দেশে ফিরলাম। পেশোয়ার জমরুদ আফগানিস্তান, দিল্লি, কলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরলাম। সেই আনন্দে আমার ছোট ভাই আমাকে একখানা রাজশাহী সিল্ক শাড়ি কিনে দিয়েছিল। লাল, নীল, চুড়িপাড়। প্রথম যেদিন শাড়িখানা পরে বাপের বাড়িতে আসার পথে আমাদের পাড়ায় যেই ঢুকেছি এক বালতি লাল রঙ এসে পড়লো আমাদের গাড়ির ভেতর। সবাই আমরা রঙ–এ ভিজে গেলাম। আমার প্রিয় শাড়িখানাও রঙ–এ লাল হয়ে গেল। বাসায় এসে জানতে পারলাম ফুটবল খেলায় জিতে ক্লাবের ছেলেদের এই আনন্দ উল্লাস।

শাড়িটা আর পরতে পারিনি। ড্রাইওয়াশ করেও রঙ ওঠেনি। আজো শাড়িটা আমার কাছে আছে। যে ছোট ভাই শাড়িটা আমাকে দিয়েছিল সে পৃথিবী থেকে চলে গেছে চিরতরে। শুধু স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে তার দেয়া শাড়িখানা।

গোপীবাগ, ঢাকা থেকে

বসনা

– মোহাম্মদ ফেরদৌস আলম

বন্ধুর বিয়েতে নিমন্ত্রণ পেলাম। খুব কাছের বন্ধু। ভাবছি কি দেয়া যায় বন্ধু পত্নীকে। অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করলাম, একটা শাড়ি দিলে মন্দ হয় না।

বাজারে গিয়ে দেখে–শুনে একটা শাড়ি কিনে ফেললাম। খুব দামি শাড়ি নয়। কিন্তু সহজে কেউ অপছন্দও করতে পারবে না। শাড়ি নিয়ে যথাসময়ে বন্ধুর বাড়িতে হাজির হলাম। যথাসময়ে বন্ধুপত্নীর সঙ্গে পরিচয় পর্ব হলো। আমার কেনা ছোট উপহার বন্ধুপত্নীকে দিলাম।

বিয়ের পর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে মাত্র দুই একবার। এরই মধ্যে আমার বন্ধুর সঙ্গে আলাপে জানতে পেরেছি আমার দেয়া শাড়িটা নাকি বন্ধুপত্নীর খুব পছন্দ হয়েছে। তারপর আরো অনেক দিন চলে গেছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে একদিন সংবাদ পেলাম আমার বন্ধুটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সংবাদটি পেলাম সপ্তাহ দুয়েক পরে। কারণ বন্ধুর বাড়ি আর আমার বাড়ির দূরত্ব প্রায় আশি মাইলের মতো। এবং জীবনের ব্যস্ততায় সব খোজখবর সময় মতো নিতেও পারি না।

সংবাদ পাওয়া মাত্রই ছুটে গেলাম বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। বন্ধুর বাবা–মা, ভাই–বোন সবাই আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাদলেন। বন্ধুপত্নীর খোজ নিতে গিয়ে শুনলাম তার মৃত্যুর দুই চার দিন পরেই তার বাবা–মা এসে বৌকে নিয়ে গেছেন। খুব কষ্ট মনেই ফিরে এলাম। বন্ধুর জন্য খুবই খারাপ লাগছিল।

আরো কিছুদিন পর একদিন সংবাদ পেলাম আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চান আমার বন্ধুপত্নী। আমার বন্ধুপত্নীর নাম শিলা। শিলাভাবীর দুই বছরের সংসারে কোনো সন্তানাদি নেই। ভাবী দেখতে বেশ সুন্দরী ছিলেন। একদিন আমার অফিসে বসে কাজে খুব ব্যস্ত আছি। পিওন এসে বললো, স্যার, একটা মহিলা আপনাকে সালাম দিয়েছেন।

বললাম, ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

চোখ তুলে তাকাতেই দেখি শিলাভাবী।

কি ব্যাপার ভাবী! কেমন আছেন? এতো দূর আসতে গেলেন কেন? পথে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? সঙ্গে আর কে কে আছে?

ভাবী বললেন, অনেক প্রশ্ন করলেন ভাই। এক সঙ্গে জবাব দেবো কিভাবে।

বললাম, বসুন ভাবী।

ভাবী নির্বাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। ভাবীর চোখে–মুখে মনে হচ্ছে অনেক অব্যক্ত কথা।

ভাবী বললেন, চলুন, একটু বাইরে কোথাও বসি।

বুঝলাম ভাবী নির্জন বা পরিচিত লোক নেই এমন স্থান চাইছেন। ঠিক আছে, চলুন। আমি বসকে বলে বাইরে এলাম। ভাবীকে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে বসলাম। অনেক কথাই ভাবী বলতে বলতে থেমে গেলেন। আমি বিহ্বলের মতো শুধু শুনেই যাচ্ছি। ভাবীর কথার সারকথা হলো, আমাকে তিনি জীবনসঙ্গী হিসেবে পেতে চান।

সেদিন ভাবীকে বিদায় জানিয়ে অনেক ভাবলাম। ব্যাপারটা মন্দ হয় না। ভাবী কম সুন্দর নন আর দশটা মেয়ের চেয়ে। এবং তিনি বহু গুণে গুণীও বটে। তাছাড়া বিধবা বন্ধুপত্নীকে পত্নী হিসেবে নেয়া হবে একটি মহৎ কাজ।

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম। বিয়ে হলো আমাদের মহা ধুমধামে। আমার এ ধরনের সিদ্ধান্তে প্রায় সবাই খুশি হলো। হালকা আলো জ্বলছে আমার বাসরঘরে। ঘরে ঢুকেই বললাম, আলো জ্বালবো?

শিলা লজ্জায় মুখ ঢাকলো। দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে শিলার কানে কানে বললাম, আমাকে পছন্দ করলে কেন পৃথিবীতে এতো মানুষ থাকতে?

শিলা বললো, আজ না হয় এসব কথা থাক।

আমি নাছোড়বান্দা।

শিলা আমার জেদের কাছে পরাজিত হয়ে বললো, যেদিন তুমি আমাকে শাড়ি উপহার দিয়েছিলে সেদিনই তোমার সম্পর্কে একটা উচু ধারণা আমার জন্মেছিল। যে ছেলে মেয়েদের সাজার প্রধানতম উপকরণ শাড়ি গিফট দিতে পারে সে আর যাই হোক খারাপ লোক নয়। তাছাড়া শাড়িটাও আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছিল। শাড়িটা এখানে নিয়েও এসেছি।

আমি তৎক্ষণাৎ লাইট জ্বালিয়ে দিলাম এবং শিলাকে বললাম, শিলা, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?

বলো।

বললাম, শিলা, আমার দেয়া উপহারটা সেই শাড়িটা আজ একটু পরবে? আমার দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

শিলা বললো, তাহলে লাইট অফ করো।

শিলার অনুরোধে লাইট অফ করলাম। আমার কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য শিলার রুমের অন্য প্রান্তে গিয়ে শাড়ি চেঞ্জ করতে গেল।

আর আমি?

বাসর ঘরে বিবসনা নয় – আমার স্ত্রীকে আমারই দেয়া পুরনো শাড়িতে বসনা দেখার প্রতীক্ষায় প্রতিটি সেকেন্ড গুণতে লাগলাম।

বগুড়া থেকে

খোটা

– রতন খান

১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাস। আমাদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম বিয়েবার্ষিকী। স্বভাবতই একটু ঘটা করে এই ম্যারেজ ডে–র আয়োজন। বৌকে একটু সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য বড় বোন এবং মেজ বোনকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে গেলাম। উদ্দেশ্য, বৌ–এর জন্য একটি আনকমন শাড়ি কেনা। শাড়ি কেনা আমার জীবনে এটাই প্রথম। ইতিপূর্বে বোন–ভাবীদের শাড়ি কেনার টাকা দিলেও নিজে বাজারে গিয়ে শাড়ি কিনিনি। বৌ–এর জন্য প্রথম শাড়ি কেনা, তার উপর প্রথম ম্যারেজ ডে। বাজার তন্ন তন্ন করছি একটি

আনকমন শাড়ির জন্য। সকাল দশটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত একটানা ঘোরাঘুরি। ক্লান্ত শরীরে একটি শাড়ি কিনে বাড়ি ফেরা যেন দুরূহ হয়ে দাড়ালো।

দীর্ঘ পাচ ঘণ্টায় বগুড়া শহরের এমন শাড়ির দোকান নেই যেখানে একাধিকবার যাইনি। রঙ পছন্দ হয়তো জমিন পছন্দ হয় না। আমি যদি বলি শাড়িটি বেশ, বড় বোন বলেন, তোর পছন্দ একেবারে গ্রাম্য। বড়আপার পছন্দ হলে মেজআপা বলেন, এ শাড়িটি সবাই পরে। একটি আনকমন শাড়ি দেখ।

অবশেষে বিরামহীন ঘোরাঘুরির পর একটি শাড়ি কিনে, নাকি বিশ্ব জয় করে বাড়ি ফেরা। শাড়িটি প্যাকেটে পুরে শপিং কাগজে মুড়ে বাক্সে ভরে রাখলাম। পাছে শাড়িটি পুরনো হয়ে যায়। তাই আর কাউকে খুলে দেখাইনি। অপেক্ষা করছি প্রতীক্ষিত আটাশ ডিসেম্বরের জন্য।

অবশেষে এলো সেই প্রতীক্ষিত দিন। রাত বারোটা এক মিনিটে ব্যাগ থেকে শাড়ির প্যাকেটটি বের করে বৌ–এর হাতে দিলাম। সে খুশি হয়ে বললো, ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানটি আমার শ্বশুরবাড়িতে। বাড়ির বড় মেয়ে। তাই আয়োজনটি চমৎকার। সন্ধ্যায় অতিথিরা আসতে শুরু করলেন। সে মানে আমার বৌ সেজেগুজে বের হলো

তবে আমার দেয়া শাড়িটা পরে নয়। মনটি খারাপ হলেও এই শুভদিনে কিছু বললাম না। যথারীতি কেক কাটা হলো। সে আমার মুখে কেক তুলে দিল। ক্লিক ক্লিক করে একের পর এক ছবি উঠলো। এক সময় অতিথিরাও ফিরে গেলেন। রাতে অতিথি বিদায় করে সে যখন ঘরে এলো তখন একটু আগের তার সঙ্গে আর মিল পেলাম না। একেবারে অন্য মূর্তি। কাদো কাদো কণ্ঠে আমার শার্ট ধরে ঝাকুনি দিয়ে বললো, জীবনের প্রথম ম্যারেজ ডে–তে এবং এই প্রথম তুমি আমাকে একটি শাড়ি দিলে তাও কি না ছেড়া।

অবাক হয়ে তাকে দেখলাম, কতো শক পেলে এমন চেহারা হতে পারে।

পরে শাড়িটি খুলে দেখেছিলাম ভাজের মাঝে বেশ কিছুটা ছেড়া। কেনার সময় আমরা তিনজন যা লক্ষ্য করিনি। চেয়েছিলাম প্রথম ম্যারেজ ডে–তে শাড়ি কিনে বৌকে সারপ্রাইজ দেবো। কিন্তু আমার জন্য যে এমন সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিল তা কে জানে।

গত ডিসেম্বরে আমাদের বিবাহিত জীবনের এক যুগ পূর্ণ হলো। আজো সে আমাকে ছেড়া শাড়ির খোটা দিতে ভোলে না।

জামতলা, বগুড়া থেকে

সংরক্ষিত

সরকারি কর্মচারী হিসেবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বেশ আরাম আয়েশের সঙ্গে। কিন্তু মাঝে মধ্যে যখন ফিরে যাই আমার অতীতে তখন যেন মনে হয় আসলে আমি কি সেই দিনের এই আমি!

আমার জন্মের সময় প্রসবকালীন জটিলতার জন্য মা মারা যান। তাই মা কেমন এ পৃথিবীতে সেটা আচ করতে পারিনি। তবে প্রায় সকলেই বলেন, আমার মা নাকি আমার ছোট খালার মতো ছিলেন দেখতে। আর ওই খালাই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন এবং লালন–পালন করেছেন।

যখন থেকে ডাকতে শিখেছি তখন থেকে ওই খালাকেই মা বলে ডেকেছি। খালু ছিলেন অল্প শিক্ষিত কৃষক। তবে শিক্ষার প্রতি ছিলেন অনুরাগী। হাজারো অভাব অনটনের মাঝে আমাকে মাঠে কাজ করার বদলে পাঠাতেন স্কুলে। আমার খালার কোনো ছেলে ছিল না। পাচ মেয়ে।

ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেলাম। সে থেকেই হাই স্কুলে ভর্তির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ও গণিতে আমাকে আমার শিক্ষকরা ফৃ পড়াতেন। কেননা টিউশনি ফি দেয়ার মতো অবস্থা আমার খালুর ছিল না। এভাবেই এসএসসি ও এইচএসসি উভয়টিতে কয়েকটিতে লেটারসহ ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করি। তারপর ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেলাম। কিন্তু খালু ভর্তি ফি কিভাবে যোগাড় করবেন সে চিন্তায় পড়ে গেলেন। অবশেষে আমার এক শিক্ষক ও পাড়ার দুই মণ্ডলের সাহায্য নিয়ে ভর্তি হলাম। কিন্তু এখন কিভাবে ক্লাস করবো? হলে কিংবা মেসে কোথাও থাকার খরচ চালানোর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। অবশেষে আবারও ওই শিক্ষক তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমার লজিংয়ের ব্যবস্থা করলেন।

সেকেন্ড ইয়ারে উঠতেই আমার খালা যাকে মা বলে ডাকি তার দ্বিতীয় মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। ছাত্র জীবন শেষ করে চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে ১২তম বিসিএস–এ উত্তীর্ণ হয়ে প্রশাসনে কর্মজীবন শুরু করি। তবে ছাত্র থাকাকালে আমার খালা আমাকে বলতেন, তুই চাকরি পেলে আমাকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিবি। কারণ মানুষের বাড়িতে যাবার মতো আমার কোনো শাড়ি নেই।

কথাটি আমার স্মরণে ছিল। প্রথম বেতন পেয়ে দুই দিনের ছুটি নিয়ে প্রত্যেকের জন্য সাধ্যমতো জিনিস কিনলাম। তবে খালার জন্য কিনলাম বেশ দামি একটা শাড়ি। মনে আশা নিয়ে ফিরছিলাম যে, এতো দিনে আমার মায়ের জন্য তার চাওয়া একটা শাড়ি দিতে পারবো। কারণ মাকে তো দেখিনি, তাই কল্পনায় খালাকেই মায়ের অবস্থানে ভাবছিলাম।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গ্রামের তিন কিলোমিটার দূরে বাসে নেমে ব্যাগটা ঝুলিয়ে হেটে চলছিলাম। গ্রামের প্রবেশ করার আগ মুহূর্তে প্রতিবেশী একজনের সঙ্গে দেখা হলে তিনি জানালেন, তোমার খালা গতকাল হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। গ্রাম্য ডাক্তার অসুখ ধরতে না পারায় ঠিক মতো চিকিৎসা করতে পারা যায়নি।

অতি কষ্টে বাড়িতে পৌছালাম। শুরু হলো কান্নার রোল। নিজেকে সামলাতে পারছিলাম না। শুধু মনে হচ্ছিল যে, খালা আমাকে না দেখা মায়ের সকল দায়িত্ব নিয়ে আমাকে লালন পালন করলেন, অথচ আমি তার চাওয়া একটি শাড়ি পরিয়ে মা বলে ডেকে আমার প্রয়াত মায়ের অতৃপ্ত আত্মাকে শান্তি দেবো কিন্তু সে সুযোগটা খোদা আমাকে দিলেন না। তাই ওই শখের শাড়িটি আমার কাছে শোকের শাড়িতে পরিণত হলো। এখনো ওই শাড়িটিতে কাউকে অংশীদার করতে পারিনি। সেটা এখনো যত্নসহকারে সংরক্ষণ করেছি। কেননা আমার খালার স্থানে অন্য কাউকে ভাবা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা বিহীন
চাপাইনবাবগঞ্জ থেকে

শস্তার তিন অবস্থা

– মোহাম্মদ নেয়ামত উল্যাহ্

সামনে রোজার ঈদ আবার মেজ বোনের প্রথম বিয়ে বার্ষিকী। রেওয়াজ অনুযায়ী বোন ও তার বরকে ঈদে কাপড়–চোপড় দিতে হবে। বরকে কাবুলি সুট ও স্যানডাল আর বোনকে শুধু শাড়ি দিলেই হবে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি হওয়ায় বাজেট দুই হাজার টাকা। বোনকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে গেলাম হাতিরপুলে ইস্টার্ন প্লাজার সামনে *মনোরম*–এ। সেখানে থেকে খয়েরি কালারের খুব সুন্দর কাবুলি সুট কেনা হলো এক হাজার পঞ্চাশ টাকায়। এরপর ইস্টার্ন প্লাজায় গিয়ে ম্যাচ করে দুইশ পঞ্চাশ টাকায় চটি স্যানডাল কেনা হলো।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল শাড়ি কেনা নিয়ে। ওর যেটাই পছন্দ হয় তার দাম বাজেট থেকে বেশ খানিকটা দূরে। ইস্টার্ন প্লাজায় শাড়ির দোকান ঘুরতে ঘুরতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তখনই একটি দোকানের সামনে গিয়ে থমকে গেলাম *ব্যবসা পরিবর্তনের জন্য আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস* লেখা দেখে। যদি বাজেটের মধ্যে কম দামে ভালো শাড়ি মিলে যায় এই আশায় দোকানের ভেতর গেলাম। ঢুকেই চোখে পড়লো দজ্জাল চেহারার স্বাস্থ্যবতী এক মহিলা। তিনি তার দুপাটি দাত বের করে ক্লোজআপের হাসি দিয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন, আসেন, আসেন, বসেন।

তিনি এটা–সেটা অনেক শাড়িই বের করলেন, কিন্তু পুরনো ডিজাইনের। পছন্দ না করে যখন চলে আসার জন্য উঠে দাড়িয়েছি ঠিক সেই সময় ওই মহিলা আবার বসতে অনুরোধ করলেন, এবং তার কর্মচারীকে (পরে জেনেছিলাম ওনার স্বামী) হুকুমের সুরে বললেন, ওই শাড়িটা বের করো তো।

তিনি ভেতর থেকে একটা জামদানি বের করলেন। শাড়িটার ডিজাইন খুব সুন্দর ছিল। তবে অনেক দিন দোকানে থাকাতে ময়লা বসে গেছে। ময়লার কথা বলতেই বিক্রেতা মহিলা বললেন, সত্তর আশি টাকা দিয়ে ড্রাই ওয়াশ করে নিলেই একেবারে নতুন হয়ে যাবে।

এদিকে বুঝতে পারলাম বোনেরও শাড়িটা পছন্দ হয়েছে। কারণ কম টাকায় বেশি দামি শাড়ি। আসলেই নতুন এ রকম একটা জামদানি কম করে হলেও এক হাজার পাচশ টাকা হবে। এ জন্যই শাড়িটা ভালো করে খুলে না দেখেই সাতশ টাকায় কিনে ফেললাম। কারণ এটা তো আর গুলিস্তান না যে ভালোভাবে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে হবে। শাড়ি কিনে ভাইবোন ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরলাম।

বাড়িতে সবাই শাড়িটা পছন্দ করলো এবং কম দামে কেনায় আমাকে বাহবা দিল। মা বললেন, যা মেজ, শাড়িটা পরে আয় দেখি কেমন লাগে।

কিছুক্ষণ পরে অন্য ঘর থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। সবাই ছুটে গেল কি ব্যাপার তা দেখার জন্য। সবার পরে আমি গেলাম, দেখি জামদানি শাড়ির আচলের ভেতরের দিয়ে মোটামুটি দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ ছেড়া। ছোট বোনকে কোনো রকমে সান্ত্বনা দিয়ে শাড়িটা ভাজ করে রেখে দিলাম। পরের দিন ইফতার করে শাড়ি ফেরত দিতে গেলাম। দোকানে গিয়ে দেখি সেই মহিলা নেই। মহিলার স্বামী আমাকে পরে আসতে বললেন। ঘুরতে ঘুরতে রাত নয়টার দিকে মহিলাকে তার দোকানে পেলাম। শাড়িটা রেখে টাকা ফেরত দিতে বলতেই, তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে বললেন,

নেয়ার সময় দেখে নেননি কেন, চোখ কোথায় ছিল? এখন আবার এসেছেন ফেরত দিতে। এ রকম শাড়ি দেড় দুই হাজার টাকার কমে কেউ বিক্রি করে নাকি? শাড়ির দোষ না থাকলে এতো কম দামে এ শাড়ি বিক্রি করে নাকি? যান যান টাকা ফেরত পাবেন না।

তখন নিজের বোকামির জন্য ইচ্ছে করছিল মাথার সব চুল ছিড়ে ফেলি। নিজেকে সংযত করে বললাম, এ শাড়ি তো আমি কোনোভাবে নেবো না।

মহিলার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করলে তা শুনে অনেক লোক ভিড় করছে দেখে সে মহিলা চট করে বললো, শাড়ি বদলে শাড়ি দেবো। কিন্তু টাকা ফেরত পাবেন না। কিছুক্ষণ পর মহিলা আমাকে টাঙ্গাইলের একটা শাড়ি ধরিয়ে দিলো। ঠিক এ রকম শাড়িই গতকাল মনোরমে দেখেছি পাচশ থেকে সাড়ে পাচশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আমি এই টাঙ্গাইলের শাড়িটা নিতে রাজি হচ্ছি না দেখে মহিলার স্বামী এগিয়ে এসে বললেন, ভাই, যেটা পেয়েছেন সেটাই নিয়ে যান, না হলে হয়তো পরে আরো কম দামি শাড়ি ধরিয়ে দেবে। তখন করার কিছুই থাকবে না।

বলা বাহুল্য, ওই লোকের কথা বলার ধরন দেখে কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলাম। তাই দেরি না করে শাড়িটা নিয়ে চুপচাপ ওই দোকান থেকে বেরিয়ে আসি। রিকশায় বাসায় আসতে আসতে ভাবছিলাম *শস্তার তিন অবস্থা।* অপেক্ষায় আছি কবে বেকারত্ব ঘুচবে আর নিজের টাকায় বোনকে একটা সুন্দর জামদানি কিনে দেবো সেই আশায়।

কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা থেকে

আফসোস

– ম.জ. আলী

ষাট দশকের শেষের দিকের ঘটনা। উঠতি যুবক বয়সে পাগলামিপনা যা সাধারণত হয়ে থাকে। এমনি এক ঘটনা মনের মধ্যে এখনো জ্বল জ্বল করছে। পড়ালেখা তখন শেষ। চাকরির সোনার হরিণ ধরার ছোটাছুটি চলছে। খোজ পেলেই শকুনের মতো হুমড়ি খেয়ে পড়ছি। কিন্তু কাজের কিছু হচ্ছে না। বেকার টাইটেলটাও ঘুচছে না। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকার পর বিকেল থেকে চলে ফিল্ডিং মেরে বেড়ানোর কাজ। ওটাই তখন মুখ্য কাজ। কখনো নদীর ধারে কখনো বা হোটেল রেস্টুরেন্টে। আবার কখনো কখনো কসমেটিকস, ছিট কাপড়, শাড়ির দোকানে। অযথা ঘোরাঘুরি, জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি, দরদাম নিয়ে তর্কাতর্কি। এখনকার মতো সে সময়ে এতো সুপারমার্কেট ছিল না। হাতে গোনা নামকরা কয়েকটি শাড়ির দোকানের মধ্যে মোটর অফিসের মোড়ের উচু সিড়িওয়ালা রহমান অ্যান্ড সন্স ছিল অন্যতম। বেশ স্ট্যান্ডার্ড। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এখান থেকেই শাড়ি কাপড় কিনতে বেশি পছন্দ করতেন। তাই সব সময়ই এখানে ভিড় লেগেই থাকতো। অবশ্য সেই দোকানটি এখন আর নেই। ওটাকে লেভেল করে অন্যভাবে মার্কেট বানানো হয়েছে। এবং সেই মোটর অফিসও দুইবার জায়গা বদল করে নিজের নামটাও আধুনিক ধাচে বানিয়ে তৃতীয় স্থানে জৌলুস বাড়াচ্ছে।

সেদিনের রুটিন মতে তিন বন্ধু মিলে ঢুকলাম সেই শাড়ির দোকানে। খুব ডাটে হুকুম দিলাম দামি সুন্দর শাড়ি দেখাতে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমরা তখন পর্যন্ত কেউ-ই বিয়েই করিনি। শাড়ি-টাড়ি ব্যাপারে একেবারেই 'র'। এবং জিনিসটা আমাদের কারো প্রয়োজনও নেই। সময় কাটানোই আসল কাজ।

দোকানের সেলসম্যানরা এতো বেশি আমাদের দেখেছে যে তাদের সব কিছু মুখস্ত। তবুও যখন খরিদ্দার, অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাড়ি বের করা শুরু করলো। আজ কালকের মতো সে সময়ে মহিলাদের একা একা এমন ফ্রি স্টাইলে কেনা-কাটা করতে বাজারে বড় একটা দেখা যেতো না। সবার সঙ্গেই একটা পুরুষ মানুষ থাকতো। তো আমাদের পাশে যে দম্পতিটি শাড়ি নাড়াচাড়া করছে সে অন্যদের চেয়ে সুন্দরী, আধুনিকা, এক কথায় আকর্ষণীয় বটে। ওদের এক রকম শুনিয়েই বলছি, আরো ভালো শাড়ি দাম যাই হোক, অসুবিধা নেই।

সেলসম্যানটি মুচকি হেসে আমাদের সন্তুষ্ট করতে প্রাণান্ত। একটা শাড়ি মেলে ধরে উজ্জ্বল মুখে বললো, এই শাড়িটা ফর্শা, কালো যে কোনো রঙয়ের মহিলাদের জন্য মানানসই শাড়ি। যে পরবে তাকেই অনিন্দ সুন্দরী মনে হবে। এটা একটা আনকমন শাড়ি।

মন ভোলানো বোল-চালে পাশের সুন্দরী মহিলাটি কৌতূহলী হয়ে সেই শাড়ির দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন। সুন্দরীর হাব-ভাবে মনে হচ্ছে আমরা এটা পছন্দ না করলে সে লুফে নেবে। আমরাও দুষ্টুমি ভরা চোখে সবই লক্ষ্য করছি, কিন্তু শাড়িটা হাত ছাড়া করছি না। এই অবস্থার মাঝে মহিলা আর থামতে না পেরে এক সময় সেলসম্যানকে বলেই ফেললেন, ওই শাড়িটির জোড়া নেই?

সেলসম্যানটি সবিনয়ে জানালো, জি না, মাত্র এক পিসই আছে।

মনে হচ্ছে ভদ্রমহিলার ওই শাড়িটিই চাই। সেলসম্যান আমাদের কাছে জানতে চাইলো, মহিলাকে শাড়িটি দেয়া যাবে কি না। শাড়ির তো আমাদের কোনো প্রয়োজনই নেই। শুধু সময় কাটানোর ব্যাপার। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি শফিকের জেদ চেপে বসলো। ও বললো, এ শাড়িটি আমি নেবো। এটা আমার দরকার।

মহিলাটি তখনো শাড়িটির দিকে তাকিয়ে আছেন। সঙ্গের ভদ্রলোককে কানে কানে কি বলার পর, মালিকের সঙ্গে নিচু গলায় কি যেন বললেন। দোকান মালিক আমাদের অনুরোধ জানিয়ে বললেন, তিনি একজন ম্যাজিস্ট্রেট, আমার পার্মানেন্ট কাস্টমার। ওনাকে এই শাড়িটা দিলে তার চেয়েও ভালো শাড়ি আপনাদের দেবো।

মহিলার রাঙা মুখের করুণ অবস্থায় আমি বিগলিত।

কিন্তু শফিক দৃঢ়কণ্ঠে কুতুব মিনারের মতো মাথা খাড়া করে শাড়ি হাতে রেখেই বললো, এটার দাম কতো বলুন?

শফিকের কথা শোনার পর মালিক ও সেলসম্যান মিলে পরামর্শ করে দাম চাইলো সাড়ে পাচশ টাকা। সেই সময়ে সাড়ে পাচশ টাকার মূল্য অনেক। আমরা বুঝতে পারছি আসলে শাড়িটির দাম এতো নয়। যাতে ওটা নিতে না পারি সে জন্যই এতো দাম হাকা হচ্ছে।

আমাদের জন্য তখন একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। কোনো কথা না বাড়িয়ে শফিক ওই দামেই রাজি হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে শফিক ধনী লোকের একমাত্র সন্তান হলেও ওই মুহূর্তে তার ব্যাগেও এতো

টাকা নেই। সবাই মিলে দামটা পরিশোধ করে শাড়ির প্যাকেটটি ঝোলাতে ঝোলাতে বীরদর্পে বিজয়ীর হাসি নিয়ে বের হবার সময় দেখি ম্যাজিস্ট্রেট দম্পতি করুণ চোখে প্যাকেটটার দিকে চেয়ে রয়েছেন। লজ্জা, অভিমান মেশানো কি সব শ্লেষ বাক্য স্বামী বেচারাকে শোনাচ্ছেন। অনর্থক এই মহিলাকে শাড়ি বঞ্চিত করে মনঃকষ্ট দেয়ার জন্য আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। শফিকের জেদে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে শুনেছিলাম মহিলা নাকি শফিকের আগের পরিচিত। তার সঙ্গে নাকি কি সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। প্রতিশোধ নিতেই সেদিন ওই কাণ্ড ঘটিয়েছিল।
জেদের বশে শাড়ি কেনার পর শফিক শান্ত হলে ঠিক হলো, ওটা দোকানে ফেরত দেয়া হবে।
ইতিমধ্যে দুই তিন দিন পার হয়ে গেছে। দোকানে গিয়ে বলা হলো ইচ্ছে করলে ওটা ম্যাজিস্ট্রেট পত্নীকে দিতে পারেন। সেদিন আমরা চলে আসার পর যে সমস্ত কথা-বার্তা, ঘটনা ঘটে গেছে সবই জানালেন বটে কিন্তু শাড়িটি ফেরত নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। মনে হলো আমাদের কাছে যে দামে বিক্রি করেছেন এতো বেশি দামে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে হয়তো বিক্রি করতে পারবেন না।
আমরা ঠিকানা নিয়ে যোগাযোগ করে জানলাম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইতিমধ্যে বদলি হয়ে চলে গেছেন। শেষে একটা ডিসিশনে আসা গেল। আমাদের তিন বন্ধুর মধ্যে সর্বপ্রথম যার বিয়ে হবে, সেই-ই হবে এই ঘটনাবহুল শাড়ির মালিক।
ঘটনাচক্রে আমার বিয়েটা সর্বপ্রথম হয়ে গেলে সেই আলোচিত মহা মূল্যবান শাড়িটি(!) আমার ভাগ্যে জুটে গেল। বিশেষ একটা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই বস্তুটি হস্তান্তর পর্ব পালন করা হলো। গিন্নি শাড়িটি পেয়ে আহ্লাদে আটখানা!
ওকে দারুণ মানাতো শাড়িটা পরলে। সেলসম্যান কথাটা সেদিন হেসে উড়িয়ে দিলেও পরে বুঝেছিলাম, হ্যা, কাব্য করার মতো শাড়ি বটে। শাড়িটির মধ্যে মোহনীয় এক রূপ আছে। ওটা পরলে অদ্ভুত এক আকর্ষণে আচ্ছন্ন করে ফেলতো আমাকে। কবি সাহিত্যিক হলে হয়তো একটা অমর কবিতা রচনা করে ফেলতাম। গিন্নিও শাড়িটির প্রতি ভীষণ দুর্বল ছিল, বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া ওটা বেরই করতো না। ওটা ছিল ওর সবচেয়ে প্রিয় শখের বস্তু।
একাত্তরের যুদ্ধ দামামায় পাক বাহিনীর তাণ্ডবের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাড়িঘর ফেলে শুধু জীবন বাচাতে আত্মগোপন করার কয়দিন পর ফিরে এসে দেখি সব কিছু লণ্ডভণ্ড। ঘরের তালাগুলো সব ভাঙা, তছনছ, একাকার। ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত এক পড়োবাড়ি যেন। সংসারের সারা জিনিসপত্র চারদিক ছাড়ানো-ছিটানো। বাড়িতে ঢুকেই গিন্নি প্রথমে তার প্রিয় শাড়িটি খুজতে শুরু করলো। অনেক কিছু চোখে পড়লো, ওই বিশেষ শাড়িটির সন্ধান মিললো না। গিন্নির সে কি আর্তনাদ। কেন সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল না, এটাই ওর বড় আফসোস। আপনজন হারানোর মতো শোকে কিছুদিন সে বোবা, স্থবির হয়ে গিয়েছিল।
শাড়ি প্রসঙ্গ উঠলে এখনো গিন্নি কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। ওটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারে না। বাজারে অনেক খোজাখুজি করেও ওই ধরনের শাড়ি এখনো গিন্নি আবিষ্কার করতে পারেনি। তাই তার মন থেকে এখনো আফসোস দূর হয়নি।

হাতেম খা, রাজশাহী থেকে

কর্মী

– পারভেজ হোছাইন

কাপড়গুলো এখনো পড়ে আছে। সেই কবে কলেজে যাওয়ার আগে বলে গিয়েছি লন্ড্রিতে দিয়ে আসতে। কলেজ থেকে আসার পরও দেখি বহাল তবিয়তেই আছে। রাগটা সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে গিয়ে ঠেকলো আমার।

এই রুমা, কাপড় কি দিয়ে এসেছিলি লন্ড্রিতে? কাজের মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম। চেচিয়ে সারা বাড়ি মাথায় তুলি।

কি সাহেবজাদা, বোমা ফাটাফাটি অবস্থা কেন? চেয়ে দেখি পাশের বাসার রুহী ভাবী। চমৎকার সুন্দর করে কথা বলেন। হাজব্যান্ডটাও পেয়েছেন যুতসই। একেবারে মানানসই যুগল। শিক্ষিতা সুন্দরী বৌয়ের শিক্ষিত রুচিশীল স্বামী শফিকভাই ব্যবসা করেন।

আর বলবেন না ভাবী, সেই কবে বলে গিয়েছি শার্ট–প্যান্টগুলো লন্ড্রিতে দিতে। এখনো দেখি যেই সেই আছে।

রুমা মাথা নিচু করে দাড়িয়ে আছে।

খালাম্মা কোথায়? ভাবী জিজ্ঞাসা করলেন।

চলুন, ভেতরে। মা ওখানেই।

মা রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। মনে হয় বাবার জন্য বিকেলের চা রেডি করছিলেন। ভাবীকে দেখে বেরিয়ে এসে বললেন, কি ব্যাপার, আমাদের খোজখবর কিছু রাখো–টাখো নাকি? একেবারে উধাও হলে যে। মা আর রুহী ভাবী এক সঙ্গে বসে মেয়েলি কথাবার্তা জমিয়ে তুললেন।

আমার রুমে এসে কাপড় পাল্টিয়ে হাত–মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম। রুমার ওপর রাগটা কমেছে। তবে তার ভয় মনে হয় এখনো কাটেনি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ভাইয়া, কাপড়গুলো দিয়ে আসি?

বললাম, না দিতে হবে না এখন আর। হতাশ হয়ে ফিরে গেল রুমা।

শরীরটা এলিয়ে দিলাম বিছানার ওপর। কিছুক্ষণ পর মা এলেন আমার রুমে।

ঘুমোচ্ছিস নাকি?

কেন মা! ও কি ব্যাপার? মাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

আজ রাতে তোকে রুহীর বাসায় থাকতে হবে। শফিক নাকি ব্যবসার কাজে ঢাকা গেছে, দুই দিনের কাজ। সন্ধ্যার সময় যাবি আর কি।

আমি থাকবো ওখানে! অবাক হওয়ার মতো করে বললাম।

মেয়েটা আমার কাছে এসে বললো, একা বলে ভয় পাচ্ছে হয়তো। তোর তো কোনো কাজ নেই। বইটই নিয়ে সন্ধ্যার সময় ওখানে গেলেই তো হয়। আমাকে অনেকটা জোর করার মতো করেই মা বললেন।

মা চলে গেলেন। এর কিছু সময় পর ভাবী এসে বললেন, শার্ট প্যান্টগুলো নিয়ে এসো। আমার ওখানে ইস্ত্রি করা যাবে। তারপর তিনি চলে গেলেন।

একা বাসায় থাকবেন সুন্দরী রুহী ভাবী আর আমি থাকবো ওখানে। ভাবতেই শিহরণ জাগছে শরীরময়।

মাগরিবের পর পরই চলে গেলাম। সঙ্গে ছিল যায়যায়দিন–এর *পাশের বাড়ি কাছের মানুষ* সংখ্যাটি। দুই একটা নোটও ছিল। রুমাকে বললাম শার্ট–প্যান্টগুলো পৌছে দিতে।

আমাকে সোজা টিভি রুমে নিয়ে গিয়ে ভাবী বসালেন। গল্প করার ফাকে যায়যায়দিনটা নেড়ে–চেড়ে দেখলেন। হয়তো দুই একটা লেখা পড়লেনও। এরই মাঝে রুমা এসে দিয়ে গেল প্যান্ট শার্টগুলো।

ভাবী কাপড়গুলো হাতে নিয়ে বললেন, তুমি বসে বসে টিভি দেখো, আমি প্যান্ট শার্টগুলো ইস্ত্রি করি। তিনি চলে গেলেন। সঙ্গে যায়যায়দিনটাও নিলেন।

অবশ্য সৌজন্যের জন্য বললাম, আমি করবো ভাবী।

কার কথা কে শোনে?

কিছুক্ষণ বসার পর একা টিভি দেখতে আর ভালো লাগছিল না। উঠে গিয়ে দেখলাম বেডরুমে কাপড় ইস্ত্রি করছেন ভাবী। বললাম, কষ্ট না করলে কি হতো না ভাবী! আমিও তো করতে পারতাম।

আচ্ছা কর্মী হয়েছো তো! ভাবী বললেন, ঠিক আছে, আমার শাড়িটাই ইস্ত্রি করো। তারপর তিনি একপাশে সরে বসলেন।

মনোযোগ দিয়ে শাড়ি ইস্ত্রি করছি। ভাবী তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কেমন নেশাভরা দৃষ্টি নিয়ে। শিহরিত হই ভেতরে ভেতরে। হাজার হলেও মেয়েমানুষের চাহনি। মনোযোগ নষ্ট হয় আমার। ইস্ত্রিটা যে বেশি গরম হয়ে গেছে খেয়ালই করিনি। শাড়ির ওপরে বসাতেই ছ্যাৎ করে উঠে এলো একটা অংশ।

হায়, সর্বনাশ! চিৎকার করে উঠলাম।

ভাবী বিষণ্ন স্বরেই বললেন, কিছু হবে না। রাখো তো ওসব।

আমি ক্ষমা চাচ্ছিলাম বার বার।

ভাবী গাল টিপে বললেন, ন্যাকামো!

রাতে ঘুমোনোর আগে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে এলাম ভাবীর কাছে। বেডরুমে শুয়ে আছেন ভাবী। আমি ক্ষমা চাইলাম বিনীতভাবে।

ভাবী বললেন, শাড়ি পুড়ে যাওয়াটাই দেখলে শুধু। আর কিছু দেখো না?

কি ভাবী?

ভাবী দ্রুত আমার ডান হাতটা টেনে নিয়ে তার বুকের ওপর স্থাপন করে বললেন, বোঝো না এই ঝড়?

অবাক হয়ে গেলাম। বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মতো কেপে উঠে আমার শরীর।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলেন ভাবী। চাপে পিষ্ট হচ্ছি আমি। ভাবীর দ্রুত নরম বিশ্বাস এসে পড়ছে আমার মুখের ওপর। আমার ভেতরটাও জেগে উঠেছে। চুমু দিতে থাকি ভাবীর নরম ঠোটে, মুখে, চোখে, কপালে, গলায়, কানের লতিতে। সর্বত্র।

ভাবীর চোখ মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। প্রচণ্ড আবেগে হঠাৎ আমার কাধে কামড় বসিয়ে দেন তিনি। ঠোট দুটি রাবারের মতো চুষতে থাকি আমি। ক্রমেই চাপতে থাকি নরম মাংসপিণ্ড দুটি। সুখের

আতিশয্যে এক সময় শরীরের সবটুকু বসন খুলে ছুড়ে ফেলে দেন ভাবী। তারপর আমরা স্থাপিত হই পরস্পরের মাঝে। এক সময় শান্ত হয়ে আসে সব কিছু।

দুজন দুজনকে জড়িয়ে কতোক্ষণ ছিলাম জানি না। তারপর আবারও ঝড় ওঠে নদীতে। আবারও দুই কূল ছাপিয়ে চলে জলের খেলা। এরপর আবারও নেমে আসে সেই স্থিতি।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি ভাবী নাশতা রেডি করে বসে আছেন। লজ্জায় মুখময় রক্তবর্ণের আধিক্য। একবার মুখ তুলে বললেন, ভালোই তো কর্মী হয়েছো। আগে তো জানতাম না।

বললাম, শফিক ভাই...।

হ্যা, সবই ঠিক আছে। একজন স্বামী, আরেকজন শুধুই কর্মী।

মনে মনে বললাম, হয়তো তাই। সবই ঠিক আছে।

বাদুড়তলা, চট্টগ্রাম থেকে

প্রথম উপার্জন

– মোস্তফা আনোয়ার

১৯৮৬ সালের কথা। তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। প্রাইমারি বৃত্তি পেয়েছি এ কথা হামিদ স্যারের মুখে শুনে খুশিতে আত্মহারা হলাম। জীবনের প্রথম সাফল্য বলে কথা! দেখতে দেখতে এক সময় স্কলারশিপের টাকা চলে এলো। একদিন আমাদের নাজমাআপা (বড় ম্যাডাম) ক্লাসে এসে বললেন, তোমাদের বৃত্তির টাকা এসেছে, ছুটির পরে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যেও।

আচমকা ম্যাডাম প্রশ্ন করে বসলেন, তোমরা বৃত্তির টাকা দিয়ে কে কি করবে? আমার বন্ধুদের কেউ বললো, গল্পের বই কিনবো, কেউ বললো খেলাধুলার সামগ্রী কেনার কথা।

আমি বললাম, আমি আমার মায়ের জন্য শাড়ি কিনবো।

আমার এ কথা শুনে সারা ক্লাসে হালকা হাসির রোল পড়ে গেল। ম্যাডাম সবাইকে মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, মোস্তফা ঠিকই বলেছে। তার মতো তোমরাও তোমাদের মা-বাবার জন্য কিছু কিনবে। জেনে রেখো, মা-বাবার মতো এতো আপন কেউ এই পৃথিবীতে নেই। অতএব তোমাদের জীবনের প্রথম উপার্জনের টাকা দিয়ে মা-বাবাকে কিছু দিলে তাদের চেয়ে বেশি আর কেউ খুশি হবে না।

শুধু বিভিন্ন সময়ে পাওয়া বৃত্তির টাকা দিয়েই নয়, লেখালেখি ও চাকরি থেকে উপার্জিত টাকা দিয়ে আমার মাকে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি কিনে দিয়েছি তা হলো শাড়ি। আমার কেনা শাড়িগুলো মা খুব যত্ন করে রাখেন। মা আমাকে প্রায়ই বলেন, তোর দেয়া শাড়িগুলো তোর বৌ এলে দেখাবো। এবং আমি যখন থাকবো না তখন শাড়িগুলো স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে দিস।

শ্রীমঙ্গল থেকে

মুচি মেথর

– এম. সেলিম

এইচএসসি ক্যালকুলাস পরীক্ষার দিন বাবা মারা গেলেন। তখন আমরা চার ভাইবোন সবাই পড়ালেখা করি। কোনো আয়ের লোক না থাকায় ফিরতে হলো গ্রামে। যশোর সরকারি সিটি কলেজ থেকে শাহপুর মধুগ্রাম কলেজে দুই বছর গ্যাপ দিয়ে আবার ফার্স্ট ইয়ার সায়েন্স থেকে আর্টস–এ ভর্তি হলাম। বড়ভাই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে একাউন্টিংয়ে (অনার্স) পড়ে এবং দায়িত্বশীল হওয়ায় বাড়ির পুরো দায়িত্ব কাধে চেপে বসলো আমার। শুরু হলো সংগ্রামী জীবন। না পারি কৃষি কাজ করতে, না পারি গ্রামে কোনো টিউশনি করতে। বাড়ির বাগানের নারিকেল, সুপারি, কলা, কাঠাল বেচে সংসার চালানো। এগুলো না থাকলে বাশ, না হয় কোনো গাছ বিক্রি করে তিনবারের খাবার জোটানো। বছর খানেক এভাবে চলার পর আর চলে না। তখন প্রায় সব শেষ, কোনো কিছু বিক্রির আর নেই।

শুরু হলো আরো কঠিন জীবন। সংসারের হাল ধরার কেউ হঠাৎ বিদায় হয়ে গেলে কি যে কষ্ট তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানে। এমনো দিন যায় যে, না খেয়ে, অর্ধাহারে দিনগুলো কোনোভাবে পার হয়ে যায় যা কাউকে বলাও যায় না, সহ্য করাও কষ্ট। এর ভেতর দিয়ে পড়ালেখার খরচ, সবার কাপড়–চোপড়, আত্মীয়স্বজন কি যে এক দুর্বিষহ জীবন। উহ!

আবারও এইচএসসি পরীক্ষার সময় এলো, ভালো পৃপারেশন নিতে পারিনি। বড়আপা এসব দেখে ও বুঝে জোর করে নিয়ে গেলেন তার বাসায় এবং কঠিন শর্ত – বাড়ির কোনো চিন্তা করা লাগবে না, সব আমি দেখবো, তোর শুধু পড়া, খাওয়া, নামাজ ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। হঠাৎ বড়আপার এই ধরনের সহযোগিতার হাত যেন আমার নিভে যাওয়া জীবনটাকে আশার আলো দেখালো, মনে হলো আমি পড়ে পাস করবো, বিএ, এমএ করবো। চাকরি করে আমাদের কষ্টের দিনগুলো হাসি–আনন্দে ভরে তুলবো, তাই সত্যি চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর আপার বাসায় বসে ষোল থেকে আঠারো ঘণ্টা রুটিন করে পড়তাম।

ছোটবেলা থেকেই শব্দ করে পড়ার অভ্যাস থাকায় রাতে যখন পড়তাম, বিশেষ করে গভীর রাতে, আশপাশে বাসাবাড়ির লোকজন কয়েকদিনের ভেতর বুঝে নিল যে, এখানে গাজি (বড়আপার বর) সাহেবের শালাবাবু সারা রাত ধরে পড়ে।

রাতে যখন পড়তাম, পাশের অনেক বড়লোক তারা, বাবা নেই পাচ বোন, কোনো ভাই নেই, তিন নাম্বার বোনটার খুব অসুবিধা হতো। আমার পড়ার শব্দে নাকি তার ঘুমের খুব ক্ষতি হয়। এই অভিযোগ করে গেল আমার বড়আপার কাছে। আপা আমাকে বললেন, একটু আস্তে পড়িস। কিন্তু আস্তে পড়লে যে আমার ঘুম আসে, পড়া মুখস্ত হয় না। তাই আপাকে বলে দিলাম আস্তে পড়তে পারবো না। আপা কিছু বললেন না। কিছুদিন পর ওই মেয়ে আবারও আপাকে অভিযোগ করে গেল রাতে যেন আমি হেড়ে গলায় না পড়ি। আপা তাকে বলে দিলেন ওর মাত্র অল্প কিছুদিন পরীক্ষার বাকি। এই কয়দিন একটু কষ্ট করো, তারপর তো চলে যাবে। কিন্তু তাতে তার অপমান হলো এবং

আপাকে বেশ অপমান করে গেল, আপা আর আমাকে কিছু বললো না শুধু বললো তোকে পড়ে পাস করতে হবে। সত্যি ওই কয়দিন যদি ওইভাবে না পড়তাম তবে পাস করতে পারতাম না।

পাস করার পর একদিন আপার বাসায় গেছি সংবাদ দিতে। দেখি জানালায় সেই মেয়ে দাড়িয়ে আমাদের দেখছে। কিছু সময় পর সেই মেয়ে আপার বাসায় এসে আমাকে বললো কি, পাস করেছেন, না ডাব্বা মেরেছেন? যেভাবে দুইটা মাস জ্বালিয়েছেন, পাস করে কি যে করবেন তা জানা আছে। কেরানির চাকরি ছাড়া কিই বা করবেন।

এই কথা শুনে আপা রেগে গিয়ে তাকে বললেন, কেরানির চাকরি করুক আর যাই করুক, তোমাদেরটা তো খেতে আসবে না।

সে বললো, সে যোগ্যতা আছে আপনাদের? বলেই চলে গেল।

আপা খুব কাদলেন। সঙ্গে আমিও । গরিব হলে কি হয় তার প্রমাণ পেলাম হাতেনাতে। তখন থেকে মনে মনে জেদ ধরলাম এমএ পাস করে একটা ভালো চাকরি করবো। করলাম এমএ পাস। এবং একটা ভালো কম্পানিতে চাকরি নিলাম। থাকতাম আপার কাছেই। মা আর ছোট বোনদের বেতনের টাকার অর্ধেকটা দিয়ে তাদের কষ্ট ভুলিয়ে দিলাম। সবই আল্লাহর ইচ্ছা।

এভাবে আরো তিনটা কম্পানির চাকরির পর একটা সরকারি চাকরিতে যোগ দিলাম। সরকারি চাকরি যখন পেলাম তখন ওই মেয়েদের পক্ষ থেকে আপার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিল। আপা তো একেবারে না বলে দিলেন এবং বেশ কথাও শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু মেয়ের পক্ষ থেকে আগের সব ঘটনা শুনে আপার কাছে ক্ষমা চেয়ে গেল আর বলে গেল, ওই মেয়ে এই ছেলেকে ছাড়া বিয়ে করবে না। এবং আমাকে নাকি সে খুব ভালোবাসে। আমি যদি তাকে বিয়ে না করি তাহলে সে সারা জীবন কুমারী থাকবে।

তবে আমার আপা, দুলাভাইসহ সবাই না বলে দিলেন। মেয়ের পক্ষ থেকে চেষ্টার ত্রুটি থাকলো না। এর ভেতর আমার কর্মস্থলেও তারা এসে উপস্থিত। তাদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করে বলে দিলাম, আমার আপা দুলাভাইকে রাজি করাতে পারলে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

হ্যান্ডসাম হওয়ায় বিভিন্ন মেয়ের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসে। আর বড়আপা ও দুলাভাইয়ের সব ওপর ছেড়ে দিই এবং বলে দিই, আপা দুলাভাই যদি একটা কলাগাছ দিয়ে বলে এটা তোর বৌ, ও আমি তাই মেনে নেবো। তাকে সুখী করার জন্য যা করার দরকার সব করবো। কিন্তু ওই মেয়েদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। শেষ পর্যন্ত আপা দুলাভাইকে রাজি করিয়ে ছাড়লো এবং তারা বললো, মেয়েকে ছেলে যেভাবে যেখানে রাখে সেখানেই, সেই অবস্থায় থাকবে।

সত্যি শেষ পর্যন্ত ওই মেয়েটাকে বিয়ে করলাম।

বাসর রাত আনন্দ, ভয়, পাওয়া, না পাওয়া সব মিলে কি যে এক অদ্ভুত শিহরণ নিয়ে এলো আমার ঘরে। কিন্তু আমি কি করবো ভেবে পাই না। ওকে ডাকবো, না বেরিয়ে যাবো, না পাশে গিয়ে নীরবে ঘুমাবো কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। চিন্তা করলাম হয়তো ইচ্ছা করেই ঘুমের ভান করে শুয়ে আছে। সাহস করে গুটি গুটি পায়ে কাছে গিয়ে দেখি সত্যি ঘুম। নিজেকে খুব অসহায় মনে হতে লাগলো। বসে পড়লাম মেঝেতে। একবার চিন্তা করি ডাকি আবার চিন্তা করি না থাক। এভাবে কেটে গেল অনেকক্ষণ।

উত্তপ্ত যৌবনের বাধ ভাঙা জোয়ারে যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছিলাম না। আবার অপরাধ বোধও হচ্ছিল। কিন্তু এক সময় সত্যি সত্যিই ওকে খুব আস্তে আস্তে ডাকলাম। আমার ডাক শুনে হঠাৎ করে ও উঠে বসলো নিজেকে কিছুটা স্বাভাবিক করে। আমাদের পক্ষ থেকে দেয়া শাড়িটা আমার মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললো, এই রকম শাড়ি মুচি-মেথরে পরে। তোমাদের টাকা নেই বললে আমি টাকা দিতাম।

আরো অনেক অকথ্য কথা সে বললো যা সত্যি বড় কষ্টের। একটু শান্ত হলে তাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম। সে তার স্থানে অনড়, আমাকে জানলো না, বুঝলো না। বোঝার চেষ্টাও করলো না। আমার কোনো কথাও শুনলো না। তার কথা বলে সে আমাকে একটা বালিশ ছুড়ে মেরে আমার সেই শাড়ি খুলে ব্লাউজ, পেটিকোট পরে আমার দিকে পাছা দিয়ে শুয়ে থাকলো।

স্বপ্নগুলো সব শেষ হয়ে গেল। মনের ভেতর যে সুন্দর সাজানো সংসার, ভালোবাসা সব এক এক করে ঝরে পড়ে গেল বিষাদে। মনটা বিষিয়ে উঠলো। সারা রাত মেঝেতে বসে না ঘুমিয়ে কেটে গেল। ফজরের আজান দিল বাসরের পোশাকে ওজু করে মসজিদে যাওয়ার আগে ওকে আবার ডাকলাম। তখন ওর উন্নত স্তন ঘুমের মাঝে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে উঠা-নামা করছে। দেখলাম কিছু সময়, ছুতে গেলাম। কিন্তু না, কে যেন বাধা দিল। পারলাম না, ব্যর্থ হয়ে গেলাম। মসজিদে নামাজে বসে অনেক সময় কাদলাম। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলাম গরিব হওয়ার অপরাধে।

মসজিদ থেকে ফিরে আবার রুমে ঢুকলাম। তখনো আবার তাকে দেখলাম। তার ব্লাউজের ফাক দিয়ে দুই স্তনের মাঝ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে গলার সোনার চেইনটা চিক চিক করছে। পুরুষত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ছিড়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে। আস্তে করে ওর মাথায় হাত রাখলাম, ও সজাগ হলো, তাকালো আমার দিকে, কিছু বললো না। ও আমাকে ওর বুকে টেনে নিল। আমি ওর ব্লাউজ, ব্রা খুলে যৌবনের প্রথম নারী দেহের স্বাদ নিলাম। ভেসে গেলাম এক অপার্থিব সুখে। কিন্তু সে সুখ বেশি সময় দীর্ঘ হলো না।

কিছু সময় পরে উঠে আস্তে করে আমাকে বলে দিল, এই নাও তোমার শাড়ি। এই শাড়ি মুচি-মেথরের শাড়ি, আমি পরবো না। এবং আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। বেরিয়ে যাও। আর আসবে না।

আমিও বের হয়ে আমার শাশুড়িকে একটা সালাম করে অফিসের কাজের কথা বলে চলে গেলাম। সামনেই সেই ভয়াবহ দিন। আমি অনেক যোগাযোগ করছি। কিন্তু আমার সমস্ত ঠিকানা ও ফোন নাম্বার থাকা সত্ত্বেও সে এবং তারা আমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করে না।

এখনো আমি মুচি-মেথরই থেকে গেলাম।

পলাশ, নরসিংদী থেকে

আমানত

– শামীম

নাম, ঠিকানা, পরিচয় তার জেনেছিলাম পত্র মিতালি গাইড থেকে। তার শখ ছিল সুন্দর মনের শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। একটু কৌতূহল বোধ করেছিলাম। তাই ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবার পর কিছুটা আবেগ, পারিপার্শ্বিক অনুপ্রেরণা ও কিছুটা ভিন্ন আমেজের বন্ধুত্ব উপভোগ করার প্রত্যাশা নিয়ে সংশয়ের দোলাচলে লিখেছিলাম তাকে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের কথা। আমাকে অবাক করে দিয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যেই উত্তর এসেছিল হ্যা জানিয়ে। তবে শর্ত ছিল বন্ধু হিসেবে শত ভাগ সৎ ও নির্ভরশীল হতে হবে।

প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর চারিত্রিক দৃঢ়তার কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি কবুল। শুরু হলো আমাদের নতুন পথ চলা। ক্যাম্পাসের ক্লাস, পড়া পরীক্ষা ইত্যাদির চাপে যখন ক্লান্ত, বন্ধুদের আড্ডায় যখন মন ভরে না তখন শেষ টনিক হিসেবে কাজ করতো তার সুন্দর হাতের লেখায় মিষ্টি–মধুর ও সাবলীল ভাষার অনুপ্রেরণা এবং বর্ণনামূলক চিঠিগুলো। অসাধারণ দক্ষতা ছিল তার ভাষার প্রয়োগ, উপস্থাপন ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে। অবাক বিস্ময়ে শুধু বার বার পড়তাম তার চিঠিগুলো। সে তুলনায় আমি ছিলাম একেবারেই আনকোরা। নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি ও প্রকৃত ঘটনাকে বোঝানোতে অপরিহার্য শব্দগুলোও মাঝে মাঝে খুজে পেতাম না যেন সব গুলিয়ে ফেলতাম। আর সেটাই নাকি তার প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

আমরা এগিয়ে চললাম সামনের দিকে নিজেদের পরিচয় থেকে পারিবারিক পরিচয় পর্যন্ত পৌছে গেলাম।

সে ছিল দুই বোন, এক ভাইয়ের মধ্যে দ্বিতীয়, বাবা সরকারি চাকরিজীবী, পড়াশোনা করছে স্থানীয় একটি কলেজে ডিগ্রি পর্যায়ে তবে আমার এক বছরের সিনিয়র। আমিও জানিয়ে ছিলাম বাবা স্কুল শিক্ষক অনেক ভাইবোনের মধ্যে আমার অবস্থান ভাই হিসেবে প্রথম। পড়াশোনা করছি রাজশাহীতে হিসাব বিজ্ঞান ফার্স্ট ইয়ারে। এভাবে চেনা–জানা আর ভাবের আদান–প্রদানের মাধ্যমে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি প্রত্যেকের উপলব্ধিতে আমরা বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলাম। কোনো কিছুই অজানা ছিল না যদিও তখনো কেউ কাউকে দেখিনি। আমাদের কখনোই তা মনে হতো না। এর সঙ্গে নতুন মাত্রা যোগ হলো রাজশাহীতে মোবাইল ফোনের কানেকশন। ইচ্ছা করলেই কথা বলতাম দুজনে। এগিয়ে চলছে সময় তার নিজস্ব গতিতে, আমরাও পিছিয়ে নেই। এরই মাঝে আমি ফার্স্ট ইয়ার, সেকেন্ড ইয়ার শেষ করে থার্ড ইয়ারের শেষ পর্যায়ে। সেও সাফল্যের সঙ্গে ডিগ্রি পাস করে মাস্টার্স–এ ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

সময়ের আবর্তে ভাগ্য আরো প্রসন্ন হলো। ১৯৯৯ সালে বাবার মুক্তিযোদ্ধা কোটা আর মেধার বলে ওদের দুই বোনেরই প্রাইমারিতে চাকরি হয়ে গেল। সূচিত হলো আর এক নতুন অধ্যায়। প্রথম মাসের বেতন তুলে আমার জন্য পাঠিয়েছিল একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। কেন এমন পাগলামি করলো জানতে চাইলে বলেছিল, কোনো কথা চলবে না। এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেই সঙ্গে

উপদেশ, পড়াশোনার অবসরে একটু বিনোদনেরও প্রয়োজন আছে। তবে পড়াশোনায় যেন ফাকি না দিই।

আমাকে নিয়ে তার অনেক স্বপ্ন। এরপর ছাতা, ক্যামেরা, ঘড়ি, সেন্ট সবই আসতে লাগলো একের পর এক। ক্যাসেট ও গল্পের বই তো লকারের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে। তার দেয়া উপহারের স্তূপে আমার দুই একটা বই, কলম এবং ক্যাসেট বড্ড বেমানান মনে হতো। কিন্তু সে বলতো এগুলোই নাকি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার।

ঘটনাপ্রবাহ এভাবে চললেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু নিয়তির লিখন ছিল অন্য রকম। চাকরি পাবার পর বাবা-মা মেয়েদের পাত্রস্থ করার চেষ্টা চালালো। এবং পেয়েও গেল। বড় মেয়ের সব কিছুই ঠিক। তবে বাদ সাধলো সে। স্পষ্ট জানিয়ে দিল আপাতত এ বিষয়ে কোনো কথা চলবে না, দুশ্চিন্তা না করে আমাকে আমার মতো থাকতে দিন।

কিছুদিন পর আমাকে জানালো, সে রাজশাহী আসতে চায়, আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমিও জানিয়ে দিলাম যে কোনো মাসের প্রথম সপ্তাহে চলে আসতে এবং মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকলাম। বাসায় ভিন্ন কারণ জানিয়ে মাসের বরাদ্দ বাড়ালাম। অবশেষে নির্ধারিত দিনে তাকে স্টেশনে রিসিভ করলাম। যদিও চিনতে কোনো সমস্যাই হয়নি তারপরও প্রথমবারের মতো দেখা বলে কথা! অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। এই অবস্থা দেখে ধমক দিয়ে বলেছিল বোকার মতো এমন করছি কেন? সঙ্গে আরো লোক আছে তো, তার সঙ্গে আরো একটি মেয়ে এসেছে। পরিচয় করিয়ে দিল, তার কাজিন, নাম হেনা। আমরা ফিরে এলাম ক্যাম্পাসে।

এর পরের কয়েকদিন ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ও সোনালি স্বপ্নের মতো। ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি পাগলের মতো। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নিজেদের ক্যামেরা বন্দী করেছি। এক সময় নিজের অজান্তেই মনে নতুন অনুভূতি জেগেছে এই সঙ্গ যদি কখনো শেষ না হতো। পরক্ষণেই মনে হলো, আমরা না বন্ধু, এতেই বা কম কি? দেখতে দেখতে তার সময় ফুরিয়ে এলো। অনেক কথার মাঝে মনে হচ্ছিল সে যেন কি বলতে গিয়েও থেমে যাচ্ছিল, বলতে পারছিল না।

শেষ দিন বিকেলে আমরা শহরে গেলাম। ইচ্ছে ছিল প্রতি মাসের সঞ্চয় আর বাড়তি কিছুসহ ওর জন্য একটা শাড়ি কিনবো। কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হবে না, হাজারো যুক্তির পাহাড় দাড় করাতে লাগলো। আমি সিদ্ধান্তে অনড় আগে শাড়ি কিনবো তারপর অন্য কথা। অবশেষে তার পছন্দের কালারের একটি সিল্ক শাড়ি কিনলাম। এরপর বাসের টিকেট কেটে দুজনই রিকশায় ফিরছিলাম। কিছুদূর আসতেই সে পরম নির্ভরতায় আমার কাধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বললো, শামীম, তোমাকে আমার জীবন থেকে হারাতে চাই না। তোমাকে অবলম্বন করে আমি বাচতে চাই সারা জীবন। তোমাকে একান্তই আমার করে পেতে চাই। তাই আজ তোমার মুখোমুখি হয়েছি। আমায় কি তুমি ফিরিয়ে দেবে?

তার কথা শুনে হাসবো না কাদবো বুঝতে পারছিলাম না। তার বলার সেই আকুতি ও এতোদিনের বন্ধুত্ব সব মিলিয়ে তার আবেদন উপেক্ষা করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। এরপর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমি সবেমাত্র ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। আরো দুই বছর লাগবে আমার পড়াশোনা শেষ করতে। এরপরও সেশন জট যে কোনো সময়ে ঘাড়ে চেপে তা আরো বিলম্বিত করতে

পারে। তারপরও চাকরির যা অবস্থা তাতে দ্রুত প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিছুটা অনিশ্চিত। তোমার পরিবার কিভাবে নেবে এই বিষয়গুলো। এবং আমারও পারিবারিক অবস্থা ব্যাখ্যা করলাম। কিন্তু তার যুক্তির কাছে হার মানতে হলো। নিজেকে সমর্পণ করতে হলো তার কাছে। শর্ত, সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে যতোদিন প্রয়োজন আর পরিবার ম্যানেজ করার দায়িত্ব তার। এখন আমার কাজ শুধু ভালো করে পড়াশোনা করা।

শুরু হলো আরেক জীবন, অন্য ধরনের পথ চলা। বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো, দুজনেই যেন ভাষা হারিয়ে ফেলছিলাম, নিজেদের ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু তা যে হবার নয়। যাবার সময় সে আমার দেয়া শাড়ি পরে সামনে এসে বললো, তোমাকে সালাম করবো।

আশপাশের পরিবেশে আমি ভীষণ লজ্জা ও অস্বস্তি বোধ করছিলাম। এসবকে উপেক্ষা করে সে যখন আমাকে পা ছুয়ে সালাম করলো তখন আমিও যেন স্বাভাবিক চেতনা হারিয়ে ফেললাম। মন্নুজান হলের গেটে অপেক্ষমান ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টি উপেক্ষা করে ওর কপালে আলতো করে একটু চুমু দিয়ে বুকে টেনে নিলাম। কিছু না বললেও পারিপার্শ্বিক কারণে সে দ্রুত নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। এরপর ইউনিভার্সিটির গেটে বাসে উঠিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় জানালাম। রুমে ফিরে দ্রুত ব্যাগ গুছিয়ে আমিও রংপুর ছুটলাম বাসায়। মাকে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে সিদ্ধান্ত চাইলাম। জানতাম আমার সিদ্ধান্তে বাবা–মা একমত না হলেও সরাসরি না বলবেন না। কিন্তু ভাইবোনরা কিছুটা আপত্তি করলো। তাদেরকে সাধ্যমতো আশ্বস্ত করে ফিরে এলাম রাজশাহী। এর মাঝে প্রায় সপ্তাহ গড়িয়ে গেছে, পড়াশোনার অবস্থা যায় যায় ভাব। তাই কিছুটা গুছিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলাম।

দুদিন না যেতেই সিরাজগঞ্জ থেকে হেনার ফোন এলো। আগামীকালই যেন ওদের বাসায় পৌছাই জানিয়ে লাইন কেটে দিল।

অজানা আশঙ্কায় রাজ্যের চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম গিয়েই দেখি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। খুব ভোরে ট্রেন ধরে নয়টা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে ওদের শহরে পৌছে গেলাম। এই শহরে আমি নতুন, তারপর পরিচয়টাও একটু অন্য রকম এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতে বাসার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম। হেনা বাসায় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। পৌছানোর পর ওর বাবা–মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললো, শামীমভাই চলুন, বাকি কথা পরে বলা যাবে।

তখনো জানি না কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। রিকশা হাসপাতাল গেটে থামলে আমি হেনাকে অনুসরণ করে তিন তলা পর্যন্ত পৌছে গেলাম। তারপর যা দেখলাম তার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম না।

বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ডেজসহ সারা শরীর শাদা কাপড়ে ঢাকা, নাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডারের নল সংযুক্ত অবস্থায় শুয়ে আছে আমার প্রিয়া, জীবনের আলো, দিবা নার্গিস। বাসা থেকে রিকশা করে স্কুল যাবার পথে পেছন থেকে ঘাতক ট্রাকের ধাক্কায় চাপা পড়ে এই অবস্থা। এখনো আশঙ্কা মুক্ত নয় বুকের পাজর ভেঙে গেছে, হাত–পায়ের মাংস ছিলে গেছে বিভিন্ন জায়গায়।

আর বর্ণনা দিতে পারবো না। আমি একেবারে নতুন। তাই পরিবেশটাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করলাম। তারপর সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলাম তার কাছে, আস্তে করে শিয়রের কাছে বসলাম। পরম

মমতায় আলতো করে কপাল ছুয়ে দিলাম। কি নিষ্পাপ মুখশ্রী নিয়ে মায়াবী ভঙ্গিমায় ঘুমিয়ে আছে আমার মানসী। অপলক চোখে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ তার দিকে। ডাক্তার এসে জানালো দ্রুত ঢাকা নিতে হবে। ব্যবস্থার ত্রুটি হলো না, সঙ্গে আমিও চললাম ঢাকা। সারা পথ শুধু এলোমেলো স্মৃতি আর ভাবনায় কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঢাকা পৌছে মেডিকালে ভর্তি হতেই সোজা অপারেশন থিয়েটার নিয়ে গেল।

প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অপারেশন চললো। এরপর ক্যাবিনে স্থানান্তর করলো। একদিন পর জ্ঞান ফিরলো। তবুও আশঙ্কা মুক্ত নয়। ডাক্তাররা আশাবাদী। কিন্তু শক্ত করে কিছুই বলতে পারছে না। এর মাঝে পরিবেশ অনেকটা হালকা হয়েছে। তারা সবাই আমার পরিচয় জেনে গেছে হেনার মাধ্যমে। জ্ঞান ফিরে আমাকে দেখতে পেয়ে যেন তৃপ্তির ও প্রশান্তির আভা তুলে একটু হাসলো যা শুধু আমিই বুঝতে পারলাম। চোখের ইশারায় কাছে ডাকলো। এগিয়ে যেতেই মনে হলো সমস্ত শক্তি দিয়ে আকড়ে ধরতে চাইছে আমায়। ব্যর্থ হয়ে চোখের দুই কোণ বেয়ে অশ্রু নেমে এলো। অনেক কষ্টে, কিছুটা অস্পষ্ট স্বরে সে আমাকে কিছু বলতে চাইছে। মাথা নামিয়ে এনে শোনার চেষ্টা করলাম। সে বললো, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আমার অবর্তমানে তুমি ভেঙে পড়ো না। নিজের প্রতি যত্ন নেবে, তোমাকে অনেক দূর যেতে হবে। পড়াশোনা শেষ করে সৎভাবে প্রতিষ্ঠা লাভের চেষ্টা করো। এবং সুন্দর দেখে একটা বৌ এনে সংসার শুরু করো তোমার দেয়া সেই শাড়িটি আমার আমানত হিসেবে তার হাতে তুলে দিও। তোমাদের ভালোবাসার মাঝে আমি বেচে থাকবো।

আর বলতে পারছিল না সে। ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, ঝাকুনি দিতে শুরু করলো। দ্রুত ডাক্তার ডাকা হলে আবার অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হলো, ডাক্তাররা সাধ্যমতো চেষ্টাও করলো। সম্ভব হলো না। আমার জীবন পথের আলো নিভে গেল, দিবা নার্গিস চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে গেল।

কি করবো ভেবে পারছিলাম না, সব কিছুই অন্ধকার মনে হচ্ছিল।

তারপরও বাস্তবতাকে মানতেই হলো। দিবাকে ছাড়াই কোনোমতে জীবনকে নিয়ে এগোচ্ছি। অতীতের সোনালি দিনগুলো আজ দুঃসহ স্মৃতি হয়ে আমাকে তাড়া করে ফেরে। এই ছোট জীবনে স্মৃতির ভার বইতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই ভারসাম্য রাখতে পারি না। সব এলোমেলো মনে হয়। তারপরও বুকের পাজরে আগলে রেখে আছি তার সেই আমানত, আমারই দেয়া দোয়েল সিল্ক শাড়িটি এবং রাখতে চাই আজীবন।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

বিনিময়

– মির্জা মতিউর রহমান

শহরেই বসবাস করি। ছেলেমেয়ে দেশের বাইরে। গিন্নি শহরেই জন্মেছে। তাই গ্রামের প্রতি তার সহজাত বিতৃষ্ণা, প্রতিপক্ষের প্রবল চাপের মুখে জমিজমা বিক্রির পরেও কয় বিঘা জমি, একটা পুকুর, একটা বাগান, মা-বাবার স্মৃতি বিজরিত করোগেটেড টিনের অতি পুরনো ঘর, মা-বাবার

কবর, এসব আকর্ষণে অথবা নাড়ির টানে মাঝে মধ্যেই গ্রামে যেতে হয়। তাই আমার গ্রামের ক্যাজুয়াল সংসার স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত।

গ্রামের বাজারে *দি রসাল মুকিম হোটেলের* কাঠের নড়বড়ে টেবিলে, বাশের মাচার চেয়ারে বসে দুটি আটার রুটি এবং রঙচটা টিনের বাটিতে ছোলার ডাল সহযোগে ডিনার সেরে একটা কবির বিড়িতে আগুন ধরিয়ে যখন সড়ক পথ ধরেছি তখন রাত নয়টা। সঙ্গে দুই ব্যাটারির অতি পুরনো সঙ্গী *এভারেডি টর্চ লাইট।* সড়ক ছেড়ে যখন পুকুর পাড়ের পায়ে চলা পথ ধরে বাড়ির দিকে চলছি, রাস্তার ডান দিকের বুড়ো গাব গাছের নিচের ঝোপ–ঝাড়গুলো বড় বেশি নড়াচড়া করছে মনে হলো। কৌতূহলী হয়ে টর্চের আলো ফেলতেই তড়াক করে একটা তরুণ দেহ একশ মিটার কার্ল লুইসের বেগে ছুটে পালালো।

আরো একটু এগিয়ে টর্চের আলো ঝোপের ভেতর ফেলে দেখলাম, সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটা নারী দেহ। মুখে হাত দিয়ে দুই চোখ ঢেকে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তার ভরাট নগ্ন দেহ, বর্ষার শঙ্খ নদীর ঢেউয়ের মতো ফুলে ফুলে উঠছে। ধমক দিলাম, *অ্যাই মেয়ে, তুমি কেডা ?*

আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই উলঙ্গ নারী মূর্তিটি ডাইভ দিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেদে উঠলো।

মির্জাচাচা দোয়াই আল্লাহর, আমারে গ্রামের পতিতা কইরেন না, আমার কোনো দোষ নাই।

আমি আবার ধমক দিলাম, চুপ করো, কাপড় পরে নাও, তারপর কি হয়েছে বলো।

এই ধমকে কাজ হলো। মেয়েটি পা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঝোপের আড়াল থেকে শাড়ি নামক একটি বস্তু গায়ে জড়িয়ে এলো যা তার রঙ হারিয়েছে অনেক আগে। পাচ সাতটি তালি লাগানোর পরেও মেয়েটির বাড়ন্ত দেহ ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে। মেয়েটির বগলের নিচে একটি অতি সাধারণ আশি নব্বই টাকা দামের একটি নতুন ইনডিয়ান শাড়ি।

এরপর ফুপিয়ে ফুপিয়ে যা বললো তা সংক্ষেপে এই – সে আমাদের পুকুরের দক্ষিণ পাড়ের বাড়ির মৃত করিম দাড়িয়ার ছেলে তালেব আলীর স্ত্রী। তালেব চট্টগ্রামে পুরনো জাহাজ ভাঙার একটি কম্পানিতে কাজ করে। আগে দুই তিন মাস পর পর আসতো কাপড় নিয়ে, টাকা নিয়ে। পনেরো বিশ দিন থাকতো তাকে আদর সোহাগ করতো, আবার চলে যেতো। সে গৃহস্থ বাড়িতে কাজ করতো। অনেক যুবক, এমনকি বয়স্ক দুই একজন মাতব্বরও আকাম কুকামের প্রস্তাব দিতো। সে কোনোদিন রাজি হয়নি। এক বছর হলো তালেব আর আসে না। এই গ্রামের এক যুবক হামিদ ওখানেই কাজ করে। সে জানিয়েছে তালেব ওখানে এক গার্মেন্টস কর্মীকে বিয়ে করেছে। সে আর আসবে না। মেয়েটি না খেয়ে থাকে প্রায়ই। কাপড়ের জন্য ঘরের বাইরে কাজেও যেতে পারে না। অনেকের মতো জামাইল্লাও তার পিছে বহুদিন হলো ঘুর ঘুর করে।

বিধবা করিমুনচাচি যার সঙ্গে সে রাতে শোয় সে আজ তাকে ধমক দিয়েছে যে, কাপড় অভাবে কাজে যেতে পারিস না, না খেয়ে মরবি? অতো ঢঙ কিসের গরিবের? জামাইল্লা যখন এতো সাধাসাধি করে, আজ রাতে মির্জাদের পুকুরের ঝোপের মদ্দি যাইয়া, জামালের লগে কাম সাইরা, কাপড়টা লইয়া আয়।

তাই আজ সে চাচির কথায়...। আবার ডুকরে কেদে উঠলো।

এবার আর ধমক দিলাম না। আস্তে তার মাথায় হাত রাখলাম। বললাম, কোনো চিন্তা করো না, আমি এ কথা গ্রামের কাউকে জানাবো না। তুমি বাড়ি যাও।

ক্লান্ত দেহটা বয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বিপরীত পায়ে চলা পথে পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে মিলিয়ে গেল। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হলো।

আমি দার্শনিক নই। সমাজ সংস্কারকও নই। আমি অতি তুচ্ছ একজন মানুষ। তবুও মনের পর্দায় ভেসে উঠলো জীবনে দেখা অনেক মহিলার শাড়ির প্রতিচ্ছবি যাদের কাছে শাড়ি লজ্জা নিবারণের জন্য একমাত্র মহার্ঘ বস্তু নয়, শাড়ি তাদের জন্য ফ্যাশন। শাড়ি তাদের জন্য টিভির পর্দায়, খবরের কাগজের পাতায় নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার এক উপকরণ। কোনো এক বিশেষ দিনে নিজেকে বিকশিত করে তোলার এক আবরণ। তাই মনে পড়লো উচ্চবিত্ত, সমাজসেবী মহিলাদের শাড়ি, মনে পড়লো একুশে ফেব্রুয়ারিতে পরিহিতা ফ্যাশন সচেতন মহিলাদের শাড়ি, নববর্ষকে বরণ করার জন্য বর্ণাঢ্য শাড়ি পরিহিতা মহিলাদের, মনে পড়লো সাবেক প্রধানমন্ত্রীর নামি–দামি শাড়ি, মনে পড়লো বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর গ্ল্যামারাস শাড়ি।

ওইসব বর্ণাঢ্য শাড়ির ঝলকানিতে চোখ ধাধিয়ে গিয়েছে কিন্তু পানি আসেনি।

নাটাইপাড়া, বগুড়া থেকে